শিক্ষাব্যবস্থা ঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

শিক্ষাব্যবস্থা ঃ
ইসলামী দৃষ্টিকোণ

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ভাষান্তরে

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

হাফেজ আকরাম ফারুক

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

প্রকাশনায় ঃ
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি
৭৩, আউটার সার্কুলার রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৫১৩৬১, ৮৩১৮৬১১

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী-১৯৮৫

ষষ্ঠ প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৮
সফর ১৪২৯
ফাল্গুন ১৪১৪

মূল্য ঃ ৬০ (ষাট) টাকা

কম্পোজ ঃ
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি কম্পিউটার সেন্টার

মুদ্রণে
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

SIKKHA BABOSTA : ISLAMI DRISTIKON, written by Sayed Abul A'la Moududi, Publised by Islamic Education Society. First Edition: January: 1985. 4th Edition: January- 2005.

Price: Tk. 60.00

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা আজ সারা দুনিয়ার মুসলমানদের সবচাইতে বড় আকাংখার বিষয়। পশ্চিমের গোলামী ও তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে যে শিক্ষার সাথে মুসলমানরা পরিচিত হয়েছে তা তাদের হৃদয়ের মূল্যবান সম্পদ ঈমানের উপরই আক্রমণ চালিয়েছে সবচেয়ে বেশী। অন্যদিকে শত বছরের অনাদরে লালিত প্রাচীন মাদ্‌রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা আধুনিক সমাজ ও মানুষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে না। এক্ষেত্রে মুসলমানরা এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার প্রত্যাশী যা একদিকে তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করবে বলিষ্ঠ ঈমানী ভিত্তি এবং অন্যদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলোকে ইসলামী জীবনাদর্শের মানদন্ডে যাচাই করে এক বলিষ্ঠ ও উন্নত মুসলিম জীবনক্ষেত্র নির্মাণে সক্ষম হবে।

বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তানায়ক আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এই গ্রন্থে ইসলামী শিক্ষার এমনিধারায় একটি অবয়ব দাঁড় করিয়েছেন। আজ থেকে প্রায় পাঁচ দশকেরও বেশি আগে লিখিত হলেও বিষয়বস্তুর মৌলিকত্ব এখনো সমগ্র বইটিকে তরতাজা রেখেছে। ইসলামী শিক্ষার দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে এটি একটি মৌলিক গ্রন্থ। এ ধরনের একটি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে পেরে ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি তার ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনকে এক ধাপ এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে করছে।

বিষয়বস্তুর অতি মৌলিকত্ব ও ইসলামী শিক্ষা দর্শনের জটিল তত্ত্বের অবতারণার কারণে মূল বইটি বেশ কঠিনই বলতে হবে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ অনুবাদকদ্বয় অধ্যাপক মোজাম্মেল হক ও জনাব আকরাম ফারুক যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। অধ্যাপক মোজাম্মেল হক (রিসার্চ স্কলার-ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি) অনুবাদের সাথে সাথে সমগ্র পান্ডুলিপি সম্পাদনা করে বিষয়বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার ব্যবস্থা করেছেন।

ইসলামী শিক্ষানুরাগী পাঠকবর্গের হাতে এ ধরনের একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বই তুলে দিতে পেরে আমরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছি বলে মনে করি।

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক
ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

সূচীপত্র

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক ত্রুটি

আজ থেকে প্রায় ২৮ বছর পূর্বে সম্ভবতঃ ১৯৩৫ সনে এ প্রশ্নটি বেশ জোরালোভাবেই উত্থাপিত হয়েছিল যে, মুসলমানদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে নাস্তিক; নাস্তিকতা ভাবাপন্ন এবং প্রকৃতিবাদে বিশ্বাসী ও তার প্রচারক এত অধিক সংখ্যায় বের হচেছ কেন? বিশেষ করে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অভিযোগ ছিলো, এখান থেকে সনদ প্রাপ্ত শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষার্থীই কেন নাস্তিকতা ও প্রকৃতিবাদের পূজারী? বিষয়টি নিয়ে সর্বত্রই যখন জল্পনা-কল্পনা এবং দেশের পত্র পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে লেখা-লেখি শুরু হলো, তখন এ অভিযোগ খতিয়ে দেখা এবং এর প্রতিকারের উপায় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার উদ্দেশ্যে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি কমিটি নিয়োগ করা হলো। কমিটি অনেক চিন্তা-ভাবনা ও বিচার বিশ্লেষণের পর এ মর্মে সিদ্ধান্তে উপনিত হলো যে, প্রচলিত সিলেবাসে ইসলামী উপাদান আগের তুলনায় কিছু বাড়িয়ে দিলেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান নাস্তিকতা ও প্রকৃতিবাদের সয়লাবের মুখে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা সম্ভব।

১৯৩৬ সনের আগষ্ট সংখ্যা তরজমানুল কুরআনে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) এ অবস্থার প্রতিকারের নিমিত্তে গৃহীত কর্মপন্থা পর্যালোচনা করেন এবং তখনকার প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক ত্রুটির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে তা দূর করার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার বিগত এপ্রিল ১৯৩৬ সনের বার্ষিক অধিবেশনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন যা অনেক দিন থেকেই দৃষ্টি দেয়ার মতই গুরুত্ববহ। অর্থাৎ দীনিয়াত বা ইসলামী বিষয়গুলোর ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতির সংশোধন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রকৃত ইসলামী জ্ঞান ও ভাবধারার স্ফুরণ।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্য সম্পর্কে বলতে গেলে এ কথা বলতে হয় যে, সরকার প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এসব বিষয় শিক্ষাদানের অতি উত্তম ব্যবস্থা বর্তমান। অন্ততপক্ষে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ের তো বটেই। সুতরাং শুধু এ উদ্দেশ্যেই মুসলমানদের আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

করার কোন প্রয়োজন ছিল না। যে কারণে মুসলমানদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারণা গড়ে উঠেছিল এবং যে কারণে তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তা শুধু এই যে, মুসলমানগণ আধুনিক জ্ঞান- বিজ্ঞানের সুবিধা লাভের সাথে সাথে মুসলমান হিসেবেও বেঁচে থাকতে চায়। সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। তাই এ জন্য দরকার মুসলমানদের একটি নিজস্ব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। যদি তাদের নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ও এ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়, সেখান থেকেও এমন সব গ্রাজুয়েট বের হয় যেমন সরকারী বিশ্ববিদ্যলয় থেকে বের হয়, যদি সেখান থেকেও স্বদেশী সাহেব অথবা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী অথবা সমাজতন্ত্রী নাস্তিক সৃষ্টি হয়, তাহলে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং তা পরিচালনা করার এমন কি বিশেষ প্রয়োজন থাকতে পারে?

এটি এমন একটি বিষয়, যার প্রতি শুরুতেই যথেষ্ট মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন ছিল। যে সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা-ভাবনা চলছিল তখন সর্ব প্রথম ভেবে দেখা উচিত ছিল যে, তাদের একটি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন কেন? আর এ প্রয়োজন পূরণ করার জন্য পন্থাই বা কি? হ্যাঁ, বর্তমান যুগের মুসলমান সম্পর্কে কোন একজন সমালোচক হয়তো যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, 'এরা কাজ করে আগে এবং ভাবে পরে।' যারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চিন্তাভাবনায় মগ্ন ছিলেন তাদের মন-মগজে এ সম্পর্কে কোন পরিকল্পনাই ছিল না। একটা মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কেমন হবে এবং কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় তার কোন নকশা বা ধ্যান ধারণাই তাদের মন-মগজে ছিলো না। এই পরিকল্পনাহীন কাজের ফলশ্রুতিতে আলীগড়েও ঠিক আরেকটি এমন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো যার একটি ইতিপূর্বে আগ্রায়, দ্বিতীয়টি লাখনৌতে এবং তৃতীয়টি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুসলিম শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করে দ্বীনিয়াত বিষয়টি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হলো। যাতে বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম করণে মুসলিম শব্দটির সংযোজনের কারণ কেউ জানতে

চাইলে তার সামনে 'কুদুরী' 'মুনিয়াতুল মুসাল্লী' এবং 'হিদায়ার' নাম ইসলামিয়াত বিষয়ের সনদ হিসেবে পেশ করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এমন কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল না যার ভিত্তিতে তা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বতন্ত্র হতে পারতো এবং প্রকৃত অর্থেই একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতো। হ'তে পারে প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অদম্য উৎসাহের কারণে এর সঠিক ও যথাযথ রূপরেখা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ পাওয়া যায় নি। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর পনেরটি বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে; এ সময়ের মধ্যেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কর্ণধারগণ একবারও অনুধাবন করতে পারলেন না, তাদের আসল লক্ষ্য কি ছিল? আর তাদের কাফেলা তা পেছনে ফেলে কোন লক্ষ্যের পানে ছুটে চলেছে? প্রথম থেকেই অবস্থা দেখে বুঝা যাচ্ছিলো, যে ঢংয়ে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চলা উচিত এটি সে ভাবে চলছে না, আর যে ফলাফল আশা করা গিয়েছিলো তাও অর্জিত হচ্ছে না। একটা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ইসলামী চরিত্র, ইসলামী স্পিরিট এবং ইসলামী কর্মপদ্ধতি ও আচরণ তাদের চরিত্রে একেবারেই অনুপস্থিত। তাদের মধ্যে ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও ইসলামী মন-মানসিকতা একেবারেই দুর্লভ। যারা এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন মুসলমানের মত দৃষ্টিভঙ্গি এবং একজন মুসলমানের মত জীবনোদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদীক্ষা যাদেরকে এতটুকু যোগ্যতাসম্পন্ন করেছে যে, জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগিয়ে তারা ইসলামী মিল্লাতের মধ্যে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চার করতে পারতো, কিংবা কমপক্ষে তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্ব-জাতির জন্য কোন উল্লেখযোগ্য খেদমত আঞ্জাম দিতে পারতো, এমন ছাত্রের সংখ্যা হয়তো শতকরা একজনও নয়। ফলাফল শুধু নেতিবাচক হলেও বলার কিছু ছিল না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদপ্রাপ্ত এবং শিক্ষারত ছাত্রদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা এমন, যাদের অস্তিত্বই ইসলামী

তাহযীব এবং মুসলিম জাতির জন্য কল্যাণবহ নয় বরং ক্ষতিকর। এরা ইসলামী প্রাণশক্তি সম্পর্কে শুধু অজ্ঞই নয় বরং পুরোপুরি বিরুদ্ধমনা। তাদের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে শুধু উদাসীনতাই নয় বরং ঘৃনার ভাবও সৃষ্টি হয়েছে। এমনভাবে তাদের মস্তিষ্ক ধোলাই করা হয়েছে যে, তা সন্দেহের সীমা ডিঙ্গিয়ে অস্বীকৃতির পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। যেসব মূলনীতিমালার উপর ইসলামের ভিত্তি, তারা এখন তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করছে।

সম্প্রতি খোদ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদ প্রাপ্ত একজন ছাত্র যিনি জন্মগতভাবে সত্যনিষ্ঠ হওয়ার কারণে মুরতাদ হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছেন-তার এক ব্যক্তিগত পত্রে প্রসংগক্রমে সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে কিছু ইংগিত দিয়েছেন। পত্রখানা প্রকাশ করার জন্য নয় এবং তা বিশেষ করে আলীগড়ের অবস্থা বর্ণনা করার জন্যও লেখা হয় নি। তাই আমরা মনে করি তাতে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সঠিক চিত্র। পত্র লেখক তার মানসিক বিবর্তনের ঘটনাক্রম এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে ইসলামী দুনিয়ার বাইরের ফিতনা এবং ফিরিংগীপনার বিবর্তিত সর্বশেষ স্তর কম্যুনিজমের সাথে মোকাবেলা করতে হয়েছে। আমি প্রথম প্রথম পাশ্চাত্যপনাকে ভয়ানক কিছু মনে করতাম না। কিন্তু আলীগড়ে লব্ধ অভিজ্ঞতা আমাকে বাস্তব সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। ইসলামী ভারতের এই জ্ঞান কেন্দ্রে বেশ কিছু সংখ্যক এমন লোকও আছে যারা ইসলামকে বর্জন করে কম্যুনিজমের প্রচার ও প্রসারে একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করেছে। কম্যুনিজমের সেবক শিক্ষকরা সব মেধাবী ও ধী-শক্তি সম্পন্ন ছাত্রদেরকে তাদের দলের ফাঁদে আটকিয়ে ফেলেন। তারা এ জন্য কম্যুনিজম গ্রহণ করেন নি যে, গরীব কৃষক এবং শ্রমিকদের সাহায্য সহযোগিতা করবেন। কেননা তাদের ব্যয়-বাহুল্যে ভরা বাস্তব জীবনে তাদের এসব গাল ভরা বুলির অন্তঃসার শুণ্যতাই প্রমাণ করে। বরং তাদের কম্যুনিজম গ্রহণ করার কারণ হলো, তারা চায় একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলনের ছত্র-ছায়ায় অবস্থান করে নিজেদের নৈতিক দুর্বলতা, নাস্তিক্যবাদী মন-মানসিকতা এবং নৈতিকতা বিবর্জিত কাজ-কর্মকে (Loose thinking) যুক্তি সিদ্ধ বলে (Justify) প্রমাণ করা। কম্যুনিজম প্রথমে

আমাকেও ধোকা দিতে সক্ষম হয়েছিল। আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, এটা ইসলামেরই একটা অনোনুমোদিত (Unauthorized) সংস্করণ। কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করার পরে জানতে পারি যে, মৌলিক লক্ষ্যের দিক থেকে ইসলাম এবং কম্যুনিজমের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ।"

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাচেছ যে, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু ক্রটিপূর্ণই নয় বরং স্যার সাইয়েদ আহমদ খান, মুহসিনুল মুলক, ভিকারুল মুলক এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যে সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং যে জন্য মুসলমানেরা তাদের সামর্থের চাইতেও বেশী উৎসাহের সাথে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নির্মাণকে স্বাগত জানিয়েছিল, সে সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উল্টো ফলাফলই এ থেকে পাওয়া যাচেছ। এরূপ একজন ইঞ্জিনিয়ার সম্পর্কে আপনার মতামত কেমন হবে, যার তৈরী মোটর গাড়ী সামনে চলার পরিবর্তে পেছনের দিকে চলে? আর আপনার দৃষ্টিতে এমন একজন ইঞ্জিনিয়ারকে কেমন বিশেষজ্ঞ বলে মনে হবে, যে তার নির্মিত মোটর গাড়ীকে একের পর এক এলোপাথাড়ি চলতে দেখেও উপলব্ধি করতে পারে না যে, তার পরিকল্পিত নকশায় নিশ্চয়ই কোন ক্রটি আছে। এরূপ কোন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আপনি আদৌ দেখতে পাবেন না। তবে আপনার জাতির শিক্ষাব্যবস্থার ইঞ্জিনিয়াররা কিরূপ দক্ষ এই বাস্তব ঘটনা থেকে তার পরিমাপ করতে পারবেন যে, তারা শিক্ষাব্যবস্থার একটি মেশিন তৈরী করেছেন যার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলা। কিন্তু এজন্য তারা যে মেশিন তৈরী করলেন তা সম্পূর্ণ উল্টো দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করল এবং এভাবে ক্রমাগত পনের বছর পর্যন্ত চললো। কিন্তু একদিনের জন্যও তারা অনুভব করতে পারলেন না যে, এর যন্ত্রপাতিতে ক্রটি আছে বরং আদৌ কোন ক্রটি আছে কি না তাও বুঝতে পারলেন না।

অনেক অঘটন সংঘঠিত হওয়ার পর এখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারছেন যে, ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী স্পিরিট বা প্রাণ-শক্তি সৃষ্টি করা মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্যসমূহের একটি।

আর এ উদ্দেশ্যে এখন তারা সাত ব্যক্তির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে তাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন যে, সঠিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে হবে এবং

দ্বীনিয়াত ও ইসলামী বিষয়সমূহ শিক্ষার জন্য এমন আধুনিক ও উন্নত উপকরণ ব্যবহারের সুপারিশ করতে হবে যা সময়ের দাবী পূরণ করতে সক্ষম এবং যা দ্বারা শিক্ষণীয় ইসলামী বিষয়সমূহ অধিক গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা যাবে।

অত্যন্ত খুশীর কথা, অতীব কল্যাণকর কথা, সকালের পথহারা যদি সন্ধ্যায় ফিরে আসে তা'হলে তাকে পথহারা বলে না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নির্মাতারা এখনও যদি অনুভব করতে পারেন যে, তাদের শিক্ষাযন্ত্র ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইনে নির্মিত হয়েছে এবং যে উদ্দেশ্যে তারা এ যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন তার উল্টো ফলাফল দানের মূল কারণ কোন দৈব-দুর্ঘটনা নয় বরং মূল ডিজাইন ও তা বাস্তবায়নের কারণেই হচেছ, তাহলে আমরাও বলব, যা হওয়ার হয়েছে এখন এসো, পূর্বের ডিজাইনের ত্রুটি কি তা ভাল করে দেখে নাও এবং আরেকটি নির্ভুল ডিজাইন অনুসারে যন্ত্রটি পুনরায় নির্মাণ করো। কিন্তু আমাদের সন্দেহ, এখনও এসব ব্যক্তিবর্গ ত্রুটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। এখনও তারা এ বিষয়টি মানতে রাজি নন যে, তাদের ডিজাইনে মৌলিক গলদ আছে। শুধুমাত্র ফলাফলের ভয়াবহ বাহ্যিক অবস্থা দেখেই তারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং হালকাভাবেই অবস্থা অবলোকন করছেন।

খোদা করুন, আমাদের এ সংশয় ভুল প্রমাণিত হোক। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা এরূপ সন্দেহ না করে পারছি না। দুই শতাব্দীর ক্রমাগত অধঃপতনের কারণে বিগত শতাব্দির মধ্যভাগে যখন তা একটি রাজনৈতিক বিপ্লব রূপে আত্মপ্রকাশ করলো তখন মুসলমানদের ডুবন্ত জাহাজকে সামলানোর জন্য গায়েবী সাহায্যে কয়েকজন সুদক্ষ নাবিক জন্ম নিলেন। সময়টা খুব একটা চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করার মত ছিল না । ভাঙ্গা ও জীর্ণ জাহাজের স্থলে নতুন ডিজাইন অনুসারে নতুন এবং স্থায়ী জাহাজ নির্মাণ করে নেয়া যায়, এরূপ চিন্তার অবকাশই বা কোথায় ছিল? তখন সামনে একটিই মাত্র প্রশ্ন ছিল। তা'হলো এই ডুবন্ত জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে কি করে রক্ষা করা যায়? এই সব নাবিকের একটি অংশ তৎক্ষনাৎ তাদের সেই পুরাতন জাহাজটির মেরামত আরম্ভ করে দিলেন। এর পূরনো তক্তাগুলোই জোড়া দেয়া হলো, ফাটল ও ছিদ্রসমূহ বন্ধ করা হলো এবং ছেড়া ফাটা পাল রিপু করে যেমন তেমনভাবে হাওয়া লাগানোর ব্যবস্থা করা হলো। নাবিকদের অন্য দলটি এক লাফে একটা নতুন বাষ্প শক্তি চালিত জাহাজ ভাড়া করলেন এবং ডুবন্ত মানুষদের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তাতে উঠিয়ে নিলেন। এভাবে উভয় দলই তাৎক্ষণিক এই বিপদকে দূর করতে আপাতত সক্ষম হলেন। কিন্তু তারা এ দুটি ব্যবস্থার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ডুবন্তদের রক্ষা

করতে সক্ষম হয়েছিলেন মাত্র। এর অধিক আর কিছু করতে পারেননি। তাদের এ কাজে যে বুদ্ধিমত্তা ও কৌশল ছিল তা শুধু এতটুকুই। তাই এ অবস্থা দূরীভূত হওয়ার পরে এখনো যারা এ দু'টো ব্যবস্থাকে হুবহু বহাল রাখতে চান তাদের কর্মপদ্ধতি বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিপন্থী। পুরনো পালের জাহাজখানাও এমন নয় যে, এতে আরোহন করে মুসলমানরা সেই সব জাতির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে যাদের কাছে এর চাইতেও হাজার গুণ গতি সম্পন্ন যান্ত্রিক জাহাজ রয়েছে। আবার ভাড়া করা বাষ্পীয় শক্তিচালিত জাহাজখানাও এমন নয় যে, এতে আরোহন করে মুসলমানরা তাদের মনযিলে মকসুদে পৌঁছতে পারে। কারণ যদিও এর সাজ-সরঞ্জাম নতুন, গতি দ্রুত এবং যান্ত্রিকও বটে তথাপিও তা তো অন্যদের জাহাজ। এর ডিজাইনও তাদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এর গতি নিয়ন্ত্রক ও নাবিক তারাই। সুতরাং এ জাহাজ দ্বারাও আমরা আশা করতে পারি না যে, তা আমাদের মনযিলে মকসুদে পৌঁছে দেবে। বরং দ্রুত গতি সম্পন্ন হওয়ার কারণে উল্টো এ আশংকা আছে যে, তা আমাদেরকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিপরীত দিকে নিয়ে যাবে এবং মনযিলে মকসুদ থেকে আমাদের দূরত্ব প্রতি দিনই বাড়তে থাকবে। তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণের জন্য যারা পুরনো জাহাজ মেরামত করে নিয়েছিলেন তাদের ভূমিকা যথার্থ ভূমিকাই ছিল। আবার যারা ভাড়া করা জাহাজে আরোহণ করে প্রাণ বাঁচালেন তারাও কিন্তু ভুল করেন নি। তবে এখন যারা পুরনো জাহাজের ওপর জেঁকে বসেছেন, তারাও ভুল করেছেন আবার যারা ভাড়া করা জাহাজ ছাড়তে রাজি নন তারাও ভুল করছেন।

প্রকৃত নেতা ও সমাজ সংস্কারকের পরিচয় হলো, তিনি চিন্তা ভাবনা ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে কাজ করেন এবং স্থান কাল ভেদে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত কোন ব্যবস্থাকে কেউ যদি সময় অতীত হওয়ার পরও অনুসরণ করতে চায় তাহলে তাদেরকেই বলে অন্ধ সমর্থক। সময়ের দাবী অনুসারে সে যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলো সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও যারা চোখ বন্ধ করে সেই পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং এতটুকুও উপলব্ধি করতে পারে না যে, অতীতে যা উপযোগী ছিল বর্তমানে তা-ই অনুপযোগী। বিগত শতাব্দীর নেতাদের তিরোধানের পর তাদের অনুসারীগণ আজও তাদের পথ আঁকড়ে ধরে চলতে চায়; অথচ তারা যে সময়ের চাহিদা পূরণের জন্য ঐ সব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সে সময় অতীত হয়ে গিয়েছে। এখন যা প্রয়োজন তা হলো চিন্তা ভাবনা ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে নতুন পন্থা অবলম্বন করা।

দুর্ভাগ্যবশত দুটি দলের কোনটিতেই আমরা একজন মুজতাহিদও দেখতে পাই না। পুরনো জাহাজের আরোহীদের কেউ খুব সাহস করে ইজতিহাদ করলেও তা এতটুকুমাত্র যে, ঐ পুরনো জাহাজেই কয়েকটি বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগিয়ে নেন এবং কিছু নতুন ডিজাইনের আসবাবপত্র সংগ্রহ করে নেন এবং একটি ক্ষুদ্র ষ্টীম ইঞ্জিন খরিদ করে নেন; যার কাজ শুধু হুইসেল বাজিয়ে মানুষকে ধোকা দেয়া যে, এ জাহাজ এখন একদম নতুন হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে নতুন জাহাজের আরোহীরা যদিও অন্যের জাহাজে আরোহন করে দ্রুতগতিতে বিপরীত দিকে চলছে তথাপি কয়েকটি পুরনো পাল নিয়ে বিংশ শতাব্দীর এই আপটুডেট জাহাজে খাটিয়েছেন। যাতে তারা জাহাজটিকে ইসলামী জাহাজ বলে নিজেদেরকে এবং মুসলমানদেরকে প্রতারিত করছেন এবং ভায়া লন্ডন হজ্জের জন্য পথ অতিক্রম করছেন।

উপমার ভাষা ছেড়ে এখন আমি স্পষ্ট করে বলব, স্যার সাইয়েদ আহমদ খানের (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন), নেতৃত্বে আলীগড় থেকে যে শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়েছিলো, তার তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানেরা যেন সেই নতুন সময়ের চাহিদার আলোকে নিজের পার্থিব স্বার্থ রক্ষা করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে উঠে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং দেশের নতুন আইন-কানুন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে অন্য জাতি থেকে পশ্চাদপদ না থেকে যায়। সেই সময় হয়তো এর চেয়ে বেশী কিছু করার কোন অবকাশই ছিলো না। যদিও এই আন্দোলনে লাভের পাশাপাশি ভয়ংকর দিকও ছিলো। কিন্তু তখন চিন্তা-ভাবনা করে ক্ষতিমুক্ত সার্বিকভাবে কল্যাণকর কোন সুষ্ঠু শিক্ষানীতি গ্রহণ করার মত অবকাশ ছিলোনা। তখন এমন কোন উপায়-উপকরণও ছিল না যা দিয়ে এ ধরনের শিক্ষানীতি অনুসারে কাজ করা সম্ভব হতো। সুতরাং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরনার্থে মুসলমানদেরকে ইতিপূর্বেই দেশে চালু হয়ে যাওয়া শিক্ষাব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেয়া হলো। তবে এর বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণের স্বল্প পরিমাণ এমন কিছু উপকরণও এতে রাখা হলো, আধুনিক শিক্ষানীতি ও প্রশিক্ষণের সাথে যার আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না। এটা ছিল একটা সাময়িক পদক্ষেপ যা আকস্মিক বিপদের মোকাবেলা করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছিলো। তবে যে সময়ে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো, সে সময় এখন অতীত হয়ে গিয়েছে। এ পদক্ষেপের আকাংখিত সুফলও তখন পাওয়া গিয়েছে এবং যে বিপদ

তখন ছিল আশংকা আকারে তা এখন রূঢ় বাস্তব হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ আন্দোলন একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত আমাদের পার্থিব ও বৈষয়িক স্বার্থ হাসিলে সহায়ক হয়েছে। তবে এর মাধ্যমে আমরা পার্থিব স্বার্থ যতটা উদ্ধার করেছি, আমাদের দ্বীনকে তার চেয়ে অনেক গুণে বেশী বিকৃত করে ফেলেছি। এ ভাবেই আমাদের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের ফিরিংগীদের আবির্ভাব ঘটেছে। এংলো মোহামেডান ও এংলো ইন্ডিয়ান জন্ম লাভ করেছে তাও আবার এমন যাদের মানসিকতায় "মোহামেডান" ও "ইন্ডিয়ান" হওয়ার অনুপাত নামে মাত্র বিদ্যমান।

যে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদেরকে আমাদের সমাজের মেরুদন্ড বলা চলে, এ শিক্ষা ব্যবস্থা তাদেরকে শুধুমাত্র কয়েকটা পদ ও খেতাবের বিনিময়ে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়দিক থেকেই ইউরোপের বস্তুবাদী সভ্যতার গোলামে পরিণত করেছে। এখন প্রশ্ন হলো, এ শিক্ষানীতি কি স্থায়ীভাবে আমাদের শিক্ষানীতি হয়ে থাকবে? এটাই যদি আমাদের স্থায়ী শিক্ষানীতি হয়ে থাকে তাহলে এখন আর আলীগড়ের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ, ভারতবর্ষের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একটি করে এ ধরনের আলীগড় রয়েছে, যেখান থেকে প্রতিনিয়ত 'এংলো মোহামেডান' ও 'এংলো ইন্ডিয়ান' তৈরী হয়ে বের হচ্ছে। উপরন্তু এ ধরনের বিষাক্ত ফসল উৎপাদন করার জন্য আমাদের খামার ভূমি রাখার প্রয়োজনীয়তাই বা কি? যদি প্রকৃতই এ অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহলে একজন চিকিৎসকের দৃষ্টি নিয়ে দেখুন, বিকৃতির মূল কারণগুলো কি এবং তা সংশোধনের উপায়ই বা কি?

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং এর বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তা ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ উল্টো। সুতরাং আমরা যদি তা হুবহু গ্রহণ করি এবং আমাদের নবীন বংশধরদের এর আলোকে গড়ে তুলি তাহলে চিরদিনের জন্য তাদেরকে হারিয়ে ফেলবো।

যে দর্শন আল্লাহকে বাদ দিয়ে বিশ্ব-জাহানের সমস্যা সমাধানের প্রয়াসী, আপনি সেই দর্শনশাস্ত্রই তাদেরকে শেখাচেছন, যে বিজ্ঞান যুক্তিকে পরিহার করে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের দাস হয়ে গিয়েছে, আপনি তাদেরকে সেই বিজ্ঞানই পড়াচেছন। আপনি তাদেরকে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন এবং সমাজ বিজ্ঞানের এমন সব শিক্ষা দিচেছন যা মূল বিষয় থেকে নিয়ে শাখা-প্রশাখা এবং তত্ত্বগত পর্যায় থেকে নিয়ে বাস্তব কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত ইসলামের তত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানের মৌলিক নীতির বিরোধী। আপনি এমন একটি সভ্যতার ছত্রছায়ায়

তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলছেন যা মূল স্পিরিট, লক্ষ্য এবং কাঠামোগত দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামী সভ্যতার বিরোধী। এ সত্ত্বেও কিসের উপর নির্ভর করে আপনি আশা পোষণ করেন যে, এর দৃষ্টিভঙ্গি হবে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, এর চরিত্র হবে ইসলামী চরিত্র এবং এর জীবন হবে ইসলামী জীবন? প্রাচীন পদ্ধতিতে কুরআন, হাদীস ও ফিকার শিক্ষাদান এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে একেবারেই বে-মানান। এ ধরনের শিক্ষা থেকে উত্তম কোন ফল লাভ করা যাবে না। একটি ফিরিংগী স্টীমারকে এর উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যেতে পারে, যাতে শুধু দেখানোর উদ্দেশ্যে একটি পাল রাখা হয়েছে। এই ফিরিংগী ষ্টীমার কিয়ামত পর্যন্ত কোন দিনও ইসলামী ষ্টীমারে রূপান্তরিত হবে না।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে সত্যিই যদি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হয়, তাহলে সর্ব প্রথম পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান হুবহু শিক্ষা দান প্রক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করুন। এসব জ্ঞান বিজ্ঞান অবিকল গ্রহণ করাটাই ঠিক নয়। প্রচলিত বর্তমান পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সরল মানসপটে এটি এমনভাবে অংকিত হয়ে যায় যে, তারা পাশ্চাত্যের সব কিছুর উপরই দৃঢ় আস্থা স্থাপন করে বসে। তাদের মধ্যে ভাল এবং মন্দ যাচাই করার যোগ্যতাই সৃষ্টি হয় না। আর সৃষ্টি হলেও তা হাজারে এক জনের মধ্যে মাত্র। তাও আবার এখান থেকে শিক্ষা সমাপনান্তে বহু বছরের গভীর পড়াশুনার পর যখন তারা জীবনের শেষ সীমায় পৌঁছে যায় এবং বাস্তবে কর্ম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এই শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হওয়া দরকার। পাশ্চাত্যের সব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শিক্ষার্থীদের সামনে সমালোচনার আলোকে উপস্থাপন করা দরকার। এই সমালোচনা হবে নিখাদ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যাতে শিক্ষার্থীরা প্রতি পদক্ষেপে এর ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো পরিহার করতে পারে এবং কার্যকর দিকগুলো গ্রহণ করতে পারে।

এর সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান ইসলামের প্রাচীন গ্রন্থাবলী থেকে হুবহু গ্রহণ করা ঠিক হবে না। বরং এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানে শেষ যুগের পন্ডিতগণ যে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন ইসলামের স্থায়ী মূলনীতি, সঠিক আকীদা-বিশ্বাস এবং অপরিবর্তনীয় আইন-কানুনকে তা থেকে ঝেড়ে মুছে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মন মগজে ইসলামের প্রকৃত স্পিরিট এবং ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য রেডিমেড কোন সিলেবাস আপনি কোথাও পাবেন না। সব কিছু একেবারে নতুনভাবে তৈরী করতে হবে। কুরআন এবং রাসূলের (সঃ) সুন্নাতের শিক্ষা সবচাইতে অগ্রগণ্য হবে। তবে এর পাঠদানকারী শিক্ষকবৃন্দ

হবেন এমন, যিনি কুরআন সুন্নাহকে যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছেন। ইসলামী আইন শাস্ত্রও অবশ্যই শিক্ষা দিতে হবে। তবে এক্ষেত্রেও প্রাচীন গ্রন্থাবলী বড় একটা কাজে আসবে না। অর্থনীতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ইসলামী দর্শনের মতবাদ সমূহ, ইতিহাস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ইসলামী ইতিহাস দর্শনের মর্মকথা এবং এভাবে প্রতিটি বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ইসলামী উপাদানসমূহকে ফলপ্রসূ , যুক্তি নির্ভর ও প্রাধান্য বিস্তারকারী উপাদান হিসেবে অংগীভূত করতে হবে।

শিক্ষক ষ্টাফের মধ্যে যে সব নাস্তিক এবং ফিরিংগীমনা শিক্ষক অনুপ্রবেশ করেছে তাদেরকে সরিয়ে দিতে হবে। সৌভাগ্যবশত ভারতবর্ষে এখন এমন একদল লোক তৈরী হয়েছে যারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হওয়ার সাথে সাথে মন-মস্তিষ্ক ও ধ্যান-ধারণার দিক থেকেও পুরোপুরি মুসলমান। ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসব জ্ঞানী লোকদেরকে একত্রিত করুন যাতে তারা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে ইসলামী ডিজাইন অনুযায়ী একটি নতুন জাহাজ নির্মাণ করে নিতে পারেন।

আপনি হয়তো বলবেনঃ ইংরেজ সরকার এরূপ একখানা জাহাজ নির্মাণ করার অনুমতি দেবেন না। কথাটা যদিও কতকটা সত্য কিন্তু আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, একজন খাঁটি মুসলমান এবং একজন খাঁটি কম্যুনিষ্টের মধ্যে কাকে সে বেশী ভাল মনে করবে? দুটির মধ্যে যে কোন একটি তাকে গ্রহণ করতেই হবে। ১৯১০ সনের 'এংলো মোহামেডান' ধরনের মুসলমান এখন আর বেশী দিন পাওয়া যাবে না। মুসলমানদের নবীন বংশধরদেরকে যদি তুমি কম্যুনিষ্ট হিসেবে দেখতে চাও তাহলে তোমার চিরন্তন মুসলিম-দুশমনী চালিয়ে যাও। ফল অবশ্যই দেখতে পাবে। আর যদি তা পছন্দ না হয় এবং কম্যুনিজমের ক্রম বর্ধমান সয়লাব রোধ করতে হয়, তাহলে শুধু একটি শক্তি তা করতে পারে সেটি হলো ইসলাম।

(তরজমানুল কুরআন, আগষ্ট, ১৯৩৬
জমাদিউল উলা-১৩৫৬ হিঃ)

মুসলমানদের জন্য নতুন শিক্ষানীতি ও কর্মসূচী

[এই প্রবন্ধটি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বীনিয়াত পাঠ্যসূচী সংস্কার কমিটি কর্তৃক প্রচারিত ও বিলিকৃত প্রশ্নমালার জবাব হিসেবে লিখে পাঠানো হয়েছিল। বাহ্যতঃ যদিও এটি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্দেশ্য করেই লিখিত, তথাপি মুসলমানদের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এর লক্ষ্য। এ প্রবন্ধে যে শিক্ষানীতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা গ্রহণ করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। আলীগড় হোক, দেওবন্দ হোক, নদওয়া হোক কিংবা জামেয়া মিল্লিয়া হোক সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ম পদ্ধতিই এখন সেকেলে হয়ে পড়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান যদি তা পুনর্বিবেচনা না করে তাহলে এসব প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা নিঃসন্দেহে হারিয়ে যাবে।]

মৌলিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রকৃত ইসলামী উদ্দীপনা সৃষ্টির প্রতি নজর দিয়ে এবং তা কার্যকরী করার জন্য কমিটি নিয়োগ করে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব মুসলমানদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কার্যালয় থেকে এতদসংক্রান্ত যেসব কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে আমি খুব মনোযোগ সহকারে তা দেখেছি। দ্বীনিয়াত ও ইসলামী বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় তা আদৌ সন্তোষজনক নয়। যে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বর্তমানে শিক্ষা দেয়া হচেছ তা নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু কমিটির সম্মানিত সদস্যদের পক্ষ থেকে যে প্রশ্নমালা তৈরী করে পাঠানো হয়েছে তা পাঠ করে মনে হয় কমিটির কাছে বর্তমানে পাঠ্যসূচী সংশোধনের বিষয়টিই বিবেচ্য এবং সম্ভবত মনে করা হচেছ যে, কয়েকখানা বই বাদ দিয়ে নতুন কিছু বই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করলেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামী উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যাবে। আমার অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে আমি বলবো এটি প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সঠিক এবং পূর্ণাংগ ধারণা নয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে আরো গভীরে প্রবেশ করে দেখা দরকার যে, কুরআন, হাদীস, ফিকহ্ ও আকায়েদের যে শিক্ষা বর্তমানে দেয়া হচেছ তা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রকৃত ইসলামী উদ্দীপনা সৃষ্টি না হওয়ার কারণ কি? যদি শুধুমাত্র দ্বীনিয়াতের পাঠ্যসূচীর ক্রটিই এর কারণ হয়ে থাকে তাহলে এর কুফল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাঠ্যসূচীর ক্রটি দূর করাই যথেষ্ট হবে। কিন্তু এর কারণ যদি আরো ব্যাপক হয়, অর্থাৎ গোটা শিক্ষনীতিতেই যদি কোন মৌলিক ক্রটি থেকে থাকে তাহলে শোধরানোর জন্য শুধু দ্বীনিয়াতের পাঠ্যসূচীর সংশোধন কোনক্রমেই যথেষ্ট হতে পারে না। এর জন্য আপনাকে

সংশোধন ও সংস্কারের ক্ষেত্রও ব্যাপক করতে হবে-তা যতই আয়াসসাধ্য এবং সমস্যাসংকুল হোক না কেন। সমস্যাটি সম্পর্কে এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তাভাবনা করে আমি যা বুঝেছি তা যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করছি।

আমার এই কথাগুলো তিনটি অংশে বিভক্ত হবে। প্রথমাংশে সমালোচনার দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষানীতির মৌলিক ত্রুটিগুলো ব্যাখ্যা করা হবে এবং মুসলমানদের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষার জন্য বর্তমানে আমাদের শিক্ষানীতি কি হওয়া উচিত তা দেখানো হবে। দ্বিতীয়াংশে সংস্কারমূলক প্রস্তাবাবলী পেশ করা হবে। আর তৃতীয়াংশে ঐ সব প্রস্তাব বাস্তবায়ণের উপায় ও পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

বর্তমানে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে তা আধুনিক শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার একটি শংকর রূপমাত্র। এতে কোন সমন্বয় বা মিল নেই। দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী ও সামঞ্জস্যহীন শিক্ষা উপাদানকে সংশ্লেষহীনভাবে হুবহু এক সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। কোন একটি কালচারের সৃষ্টি ও লালনের মত শক্তিশালী করে এ দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে কোন সংশ্লেষ তৈরী করা হয়নি। একই স্থানে এক সাথে জুড়ে দেয়া সত্ত্বেও দুটি উপাদান যে শুধু পৃথক পৃথক রয়ে গিয়েছে তাই নয় বরং একটি আরেকটির বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বমুখর হয়ে শিক্ষার্থীদের মন মস্তিষ্ককেও দুটি বিপরীত মেরুর দিকে আকর্ষণ করছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণের কথা বাদ দিয়ে যদি নিছক শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা যায়, তাহলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, শিক্ষা ব্যবস্থার এ ধরনের বিপরীত ও পরস্পর বিরোধী উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটানো মূলতঃই ত্রুটিপূর্ণ এবং এভাবে কল্যাণকর কোন ফল লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে এই সংমিশ্রণ আরো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ হলো, প্রথমত শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ধরনের সংমিশ্রণই ঠিক নয়। উপরন্তু আরো ক্ষতিকর দিক হলো এই সংমিশ্রণও অনুপাত ঠিক রেখে করা হয়নি। এতে পাশ্চাত্য শিক্ষার উপাদানকে অত্যন্ত শক্তিশালী করা হয়েছে এবং তার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষার উপাদানকে অত্যন্ত দুর্বল করা হয়েছে। পাশ্চাত্য উপাদানটির পয়লা সুবিধা হলো তা এমন একটি যুগোপযুগী উপাদান যার পেছনে রয়েছে যুগের গতিধারার আনুকূল্য আর যাকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী একটি শক্তিশালী সভ্যতা। অধিকন্তু তা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় ঠিক ততটা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী করে গ্রহণ করা হয়েছে; যতটা

পাশ্চাত্য কালচারের লালনের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্বদ্যিালয় সমূহে আছে এবং থাকা দরকার। এখানে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে যে, পাশ্চাত্যের আদর্শ এবং মতবাদসমূহ সরলমনা মুসলমান ছেলেদের মানসপটে দৃঢ় বিশ্বাস রূপে ক্ষোদিত হয়ে যায় এবং তাদের মানসিকতা পুরোপুরি পাশ্চাত্য ধাঁচে গড়ে ওঠে।

তখন তারা পাশ্চাত্যের চোখ দিয়ে সবকিছু দেখতে শুরু করে এবং পাশ্চাত্যের মগজ দিয়ে সব কিছু চিন্তা করে। সংগে সংগে তাদের মনে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, দুনিয়াতে যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য কিছু থাকলে তা অবশ্যই পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এরপর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যত যে সব শিক্ষা দেয়া হয় তা তাদের ঐ অনুভূতি ও উপলব্ধিকে আরো শক্তিশালী করে। পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, আদব-লেহাজ, চলন-বলন, খেলা-ধুলা মোটকথা এমন কিছু কি আছে যার ওপর পাশ্চাত্য-তাহযীব-তমদ্দুন এবং পাশ্চাত্যপনার আধিপত্য নেই? পুরনো হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সন্দেহাতীতভাবে পাশ্চাত্যের। আর এ ধরনের পরিবেশের প্রভাব ও ফলাফল যা হতে পারে এবং হয়ে থাকে তা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে সক্ষম। পক্ষান্তরে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী উপাদানকে একান্তই দুর্বল করে রাখা হয়েছে। একে তো তা স্বীয় সভ্যতা ও রাজনৈতিক শক্তি হারিয়ে স্বতঃই দুর্বল হয়ে পড়েছে, তদুপরি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব বইয়ের সাহায্যে এই শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে তা এখন থেকে কয়েকশ বছর পূর্বে লেখা হয়েছিলো। এর ভাষা, এর বিন্যাস এবং এর রচনাশৈলী বর্তমান যুগের মন মগজকে আবেদন করতে পারে না। এসব গ্রন্থে ইসলামের শাশ্বত স্থায়ী নীতিগুলোকে যেসব অবস্থা ও বাস্তব সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে তার অধিকাংশই এখন আর বর্তমান নেই। আর বর্তমানে যে সব সমস্যা আছে নীতিগুলোকে সে ক্ষেত্রে প্রয়োগেরও কোন চেষ্টা নেই। অধিকন্তু এই শিক্ষার পেছনে কোন প্রশিক্ষণ, জীবন্ত কোন পরিবেশ, কোন বাস্তব প্রয়োগ এবং প্রচলনও নেই। এভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার সাথে ইসলামী শিক্ষার সংমিশ্রণ আরো বেশী অকার্যকর ও প্রভাবহীন হয়ে পড়েছে। এ ধরনের অসম সংমিশ্রনের স্বাভাবিক ফল হলো শিক্ষার্থীদের মন-মগজে পাশ্চাত্য শিক্ষার উপাদনটি আরো দৃঢ়মূল হয়ে যাওয়া এবং ইসলামী শিক্ষার উপাদানটি একেবারেই তুচ্ছ হয়ে যাওয়া কিংবা খুব বেশী হলে অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্নের মর্যাদা নিয়ে অবশিষ্ট থাকা।

আমি সাফ সাফ কথা বলছি বলে ক্ষমাপ্রার্থী। তবে আমি যা কিছু দেখতে পাচিছ তা হুবহু তুলে ধরা নিজের কর্তব্য বলে মনে করি। আমার দৃষ্টিতে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বীনি এবং দুনিয়াবী শিক্ষার সমন্বয়টা সামগ্রিকভাবে এমন, যেন আপনি এক ব্যক্তিতে আপাদমস্তক অমুসলিম হিসেবে গড়ে তুলছেন, এর পর তার বগলে এক বান্ডিল দ্বীনিয়াতের বই গুঁজে দিচ্ছেন। উদ্দেশ্য, আপনি তাকে অমুসলিম হিসেবে গড়ে তুলেছেন কেউ যেন এই অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে। আর যদি সে ঐ ধর্মীয় পুস্তকের বান্ডিল বগল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, (যার মূল কারণ আপনার শিক্ষাব্যবস্থা) তাহলে তাকেই যেন এ জন্য অভিযুক্ত করা হয়। এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি থেকে মুসলমান সৃষ্টি হবে বলে যদি আপনি আশা করেন তাহলে বুঝতে হবে আপনি অলৌকিক বা অতি অস্বাভাবিক কিছু আশা করে বসে আছেন। কারণ আপনারি সরবরাহকৃত উপায় উপকরণ দ্বারা স্বাভাবিক নিয়মে এরূপ ফলাফল আশা করা যেতে পারে না। শতকরা এক দু'জন শিক্ষার্থীর (আকীদা ও আমলের বিচারে) পূর্ণ মুসলমান থেকে যাওয়া এ শিক্ষাব্যবস্থার বা আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের সফলতার কোন প্রমাণ নয়। বরং তা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এখনো যারা তাদের ঈমান আকীদা ও ইসলামকে বাঁচিয়ে নিতে সক্ষম হলো তারা আসলে ইব্রাহীমী স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলো। এ ধরনের ব্যতিক্রম যেমন আলীগড় থেকে সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়, ঠিক তেমনি ব্যতিক্রম ভারতের অন্যান্য সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় তথা ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যেও দেখা যায় যাদের পাঠ্যসূচীতে আদৌ কোন ইসলামী উপাদান নেই।

এখন যদি আপনি এই পরিস্থিতি ও শিক্ষা পদ্ধতি অবিকল অক্ষুন্ন রাখেন এবং শুধু দ্বীনিয়াতের বর্তমান পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করে আরো বেশী শক্তিশালী পাঠ্যসূচী অন্তর্ভুক্ত করেন তাহলেও যে ফলাফল দাঁড়াবে তা হলো ইসলাম ও ফিরিংগীপনার মধ্যে সংঘাত আরো তীব্রতর হবে। তাতে প্রতিটি ছাত্রের মন-মস্তিষ্ক হয়ে উঠবে এক একটি যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে পরস্পর বিরোধী দুটি শক্তি পূর্ণ শক্তিতে নিরন্তর যুদ্ধরত থাকবে এবং পরিনামে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তিনটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

এক গোষ্ঠী এমন হবে যাদের ওপর পূর্ণ মাত্রায় ফিরিংগীপনার প্রভাব থাকবে। সে ফিরিংগীপনা বিলেতী সাহেবদের ঢংয়েও হতে পারে, ভারতীয় স্বদেশ পূজার ঢংয়েও হতে পারে কিংবা নাস্তিকতাবাদী সমাজতন্ত্রের রূপ নিয়েও হতে পারে।

দ্বিতীয় গোষ্ঠী হবে এমন যাদের ওপর পূর্ণ প্রভাব থাকবে ইসলামের। তা ইসলামের প্রভাব গভীরভাবে প্রভাবিত হতে পারে অথবা ফিরিংগীপনার প্রভাব দুর্বলও হতে পারে।

তৃতীয় আরেক গোষ্ঠী হবে এমন-যারা না হবে পুরোপুরি মুসলমান, না হবে পুরোপুরি ফিরিংগী। আর এটা স্পষ্ট যে, শিক্ষাব্যবস্থার এই ফলাফল কোন সন্তোষজনক ফলাফল নয়। নিরেট শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকেও এ দুটি পরস্পর বিরোধী উপাদানের সংমিশ্রণকে কল্যাণপ্রসূ বলা যেতে পারে না। আর জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় তার অস্তিত্ব বৈধ প্রমাণ করতে পারে না যার অর্জিত ফলাফলের দুই তৃতীয়াংশ জাতীয় স্বার্থ বিরোধী এবং জাতীয় তাহযীব-তমুদ্দুনের সমূহ ক্ষতিরই নামান্তর। অন্তত গরীব মুসলমান কওমের জন্য তা খুবই দুর্মূল্য। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এমন একটি টাকশাল চালু করা হলো যার থেকে সব সময় শতকরা তেত্রিশ ভাগ অচল মুদ্রা তৈরী হয়ে আসে, আর তেত্রিশ ভাগ আমাদের ব্যয়ে তৈরী হয়ে অন্যের ঝুলিতে চলে যায়-তথা চূড়ান্তভাবে আমাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রথমত শিক্ষার ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী উপাদানের সংমিশ্রণ নীতিগতভাবে ভ্রান্ত। দ্বিতীয়ত এ ধরনের সংমিশ্রণ কোন ভাবেই ইসলামী স্বার্থের জন্য কল্যাণকর নয়। তা এ পর্যন্ত যা হয়ে আসছে, সে ধরনের অসম সংমিশ্রণ হলে কল্যাণকর নয়, আবার যা করার চিন্তা ভাবনা করা হচেছ সে ধরনের সুষম সংমিশ্রণ হলেও কল্যাণকর নয়।

এসব বিষয় বিশ্লেষণ করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য পেশ করতে চাই।

এটা সর্বজন বিদিত যে, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় কোন না কোন কালচারের লালন করে থাকে। কোন উদ্দেশ্য বা পদ্ধতি নেই এমন নিরেট শিক্ষা আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেয়া হয়নি এবং এখনো হচেছ না। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে দেয়া হয়ে থাকে। বিশেষ কালচারের লালন ও প্রতিপালনের জন্য তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গভীর চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নিরূপিত হয়। এখন প্রশ্ন হলো আপনার বিশ্ববিদ্যালয় কোন্ কালচার সংস্কৃতির লালন ও বিকাশের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? যদি তা পাশ্চাত্যের কালচার হয়ে থাকে তাহলে এটিকে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় বলা ঠিক হবে না, কিংবা এর সিলেবাসের কিছু অংশে দ্বীনিয়াত

শিক্ষার ব্যবস্থা রেখে শিক্ষার্থীদের মানসিক দ্বন্দ্ব বাড়ানো যাবে না। আর যদি ইসলামী কালচার হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোই পরিবর্তন হওয়া দরকার। আর গোটা সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এমনভাবে পুণর্গঠন করা দরকার যেন তা সামগ্রিকভাবে উক্ত সংস্কৃতির মেজাজ ও ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আর তা যেন শুধু ইসলামী সংস্কৃতির রক্ষকই না হয় বরং এর উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য একটি উত্তম সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

বর্তমান অবস্থায় আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী সংস্কৃতির নয় বরং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সেবা করে যাচেছ। আমি আগেই একথা প্রমাণ করেছি। এই অবস্থায় দ্বীনিয়াতের বর্তমান সিলেবাস বদলিয়ে একটু উন্নত করলে এবং শিক্ষার অন্যান্য বিভাগসমূহে পাশ্চাত্যপনা পুরোপুরি বহাল থাকলে শুধু এতটুকু পরিবর্তনের দ্বারা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী সংস্কৃতির সেবক হতে পারবে না। ইসলামের বুনিয়াদী বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করলে আপনা থেকেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পার্থিব ও দ্বীনি শিক্ষাকে বিচিছন্ন করে দেখা এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে সংমিশ্রণ তৈরী করা একেবারেই নিরর্থক। খৃষ্টধর্মের মত ইসলাম নিছক এমন কোন ধর্ম নয় যেখানে দ্বীন ও দুনিয়া পরস্পর বিচিছন্নভাবে বর্তমান। দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ইসলাম শুধু আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিকতার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে না । এ কারণে খৃষ্টধর্মের ধর্মীয় বিষয়গুলোর মত ইসলামে দ্বীনি বিষয়গুলোকে দুনিয়াবী বিষয় থেকে আলাদা করা যায় না। ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো মানুষকে দুনিয়াতে টিকে থাকতে এবং দুনিয়ার সমুদয় কাজ কর্ম আঞ্জাম দিতে এমন এক পদ্ধতি গড়ে তোলা যা এই পার্থিব জীবন থেকে নিয়ে আখেরাতের জীবন পর্যন্ত প্রসারিত এবং সেটিই নিরাপত্তা, মর্যাদা ও মহত্ত্বের সোপান। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারাকে পরিশুদ্ধ করে, তার নৈতিক মূল্যবোধসমূহ পরিশীলিত করে, তার জীবনধারাকে একটি বিশেষ ছাঁচে ঢেলে নির্মাণ করে, তার অধিকার ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেয় এবং সামাজিক জীবনের জন্য একটি বিশেষ বিধান রচনা করে দেয়। ব্যক্তির চিন্তাগত ও বাস্তব প্রশিক্ষণ, সমাজের বিনির্মাণ ও সংগঠন এবং জীবনের সকল বিভাগের প্রশিক্ষণ ও ভারসাম্যের জন্য ইসলামের মূলনীতি ও আইন-কানুন অন্য যে কোন বিধান থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা। এসব মূলনীতি ও আইন-কানুনের কারণে ইসলামী সভ্যতা একটি স্বতন্ত্র ও অনুপম সভ্যতার রূপ পরিগ্রহ করে। একটি জাতি হিসেবে মুসলমান জাতির বেঁচে থাকা এই সব

মূলনীতি ও আইন-কানুনকে মেনে চলার ওপর নির্ভরশীল। যদি জীবন এবং জীবনের বিভিন্ন কর্মতৎপরতার সাথে এর কোন সম্পর্কই না থাকে, তা হলে সে ক্ষেত্রে ইসলামী দ্বীনিয়াত পরিভাষাটি একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। যে সব আলেম ও পন্ডিত ইসলামের 'আকায়েদ' এবং মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল কিন্তু তার সাহায্যে জ্ঞানও কর্মের জগতে এগিয়ে যেতে পারেন না এবং জীবনের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পরিবেশ ও সমস্যায় সেগুলো প্রয়োগ করতে জানেন না, ইসলামী সংস্কৃতির সেবা ও লালনে সেসব আলেম ও পন্ডিতবর্গ একেবারেই অযোগ্য। তেমনি যারা পার্থিব জ্ঞান সমৃদ্ধ, যারা অন্তরে ইসলামের সত্যতার প্রতি ঈমান পোষণ করে কিন্তু তাদের মস্তিষ্ক অ-ইসলামী নীতির ভিত্তিতেই এর বিন্যাস ঘটায়, পার্থিব জ্ঞানে সমৃদ্ধ সেই সব আলেম এবং পন্ডিতবর্গও ইসলামী সংস্কৃতির লালন ও সেবায় অক্ষম। প্রকৃত পক্ষে মুসলিম জাতির মধ্যে দীর্ঘ দিন থেকে শুধু এই দু'ধরনের পন্ডিত ও বিদ্বানই তৈরী হচেছ। তাই ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতার এমন অধঃপতন ঘটেছে। এ কারণে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে পার্থিব জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আজ আবার যদি আমরা চাই যে, ইসলামী কালচার পুনরায় তারুণ্য লাভ করুক এবং যুগের পেছনে পেছনে না চলে তা আগে আগে চলুক তাহলে এই ছিন্ন সম্পর্ক আবার বহাল করতে হবে। পুনর্বহাল করার পন্থা এটা নয় যে, শিক্ষারূপ দেহের গলায় তা হারের মত লটকিয়ে দেবেন কিংবা ঘন্টির মত কোমরে ঝুলিয়ে দেবেন। কোন অবস্থাতেই তা যথেষ্ট হবে না। বরং গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে তা এমনভাবে অন্তর্লীন করে দেবেন যাতে তা এর রক্তপ্রবাহ, প্রাণ চাঞ্চল্য, দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি, অনুভূতি-উপলব্ধি ও চিন্তা-ভাবনায় অংগীভূত হয়ে যায় এবং সাথে সাথে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প কলার উত্তম উপাদানগুলো আত্মস্থ করে স্বীয় তাহযীবের অংগীভূত করতে থাকে। এভাবে মুসলিম দার্শনিক, মুসলিম বৈজ্ঞানিক, মুসলিম অর্থনীতিবিদ, মুসলিম আইনবিদ, মুসলিম প্রশাসক, মোট কথা জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সকল অংগনের জন্য মুসলিম বিশেষজ্ঞ তৈরী করা সম্ভব হবে যারা জীবনের সব সমস্যার সমাধান ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে করবে। তারা আধুনিক সভ্যতার উন্নত উপায় উপকরণকে ইসলামী সভ্যতার সেবায় নিয়োজিত করবে এবং ইসলামী ধ্যান-ধারণা, মতবাদ ও জীবন যাপনের আইন-কানুন ও নিয়ম নীতিকে যুগ চাহিদার আলোকে পুনর্বিন্যস্ত করবে। এমনকি জ্ঞান ও কর্মক্ষেত্রে আলোর সন্ধান দিতে ইসলাম পুনরায় নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হবে- যা তার সৃষ্টির অভিষ্ট লক্ষ্য।

এটাই মুসলমানদের নতুন শিক্ষা নীতির মূল বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। স্যার সাইয়েদ আহমদ আমাদেরকে যেখানে রেখে গিয়েছিলেন যুগ সেখান থেকে আরো বহু দূরে এগিয়ে গিয়েছে। এখন কথা হলো দীর্ঘদিন পর্যন্ত যদি আমরা এখানেই অবস্থান করি তাহলে মুসলিম জাতি হিসেবে আমাদের উন্নতি করা তো দূরের কথা বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে পড়বে।

ইসলামী শিক্ষানীতির মূল বিষয় যা আমি উপরে বর্ণনা করেছি তাকে কিভাবে বাস্তব রূপ দেয়া যেতে পারে আমি এখন সে বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

(১) মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দী থেকে ফিরিংগীপনার মূলোৎপাটন একান্ত জরুরী। আমরা যদি আমাদের জাতীয় তাহযীব-তমুদ্দুনকে নিজ হাতে ধ্বংস করতে না চাই তাহলে ফিরিংগীপনার প্রতি আমাদের নবীন বংশধরদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ সৃষ্টির কারণ নির্ণয় ও তার দ্বার রুদ্ধ করা আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য। এই আগ্রহ ও আকর্ষণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের গোলামী মানসিকতা ও প্রচ্ছন্ন হীনমন্যতা বোধের সৃষ্টি। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিকতা, আচার-আচরণ, চলন-বলন এবং সামগ্রিকভাবে গোটা সামাজিক পরিবেশে বাস্তবে যখন এর প্রকাশ ঘটে তখন তা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকে আমাদের মন-মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং জাতীয় মর্যাদাবোধ নামে মাত্রও আর অবশিষ্ট থাকে না। এমতাবস্থায় ইসলামী সভ্যতার পক্ষে বেঁচে থাকা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কোন সভ্যতাই নিছক তার মূলনীতি এবং মৌলিক ধ্যান-ধারণার তাত্ত্বিক অস্তিত্ব থেকে জন্মলাভ করে না বরং তা ব্যবহারিক আচরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এবং এভাবেই ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যদি তার কোন অস্তিত্ব না থাকে তাহলে সেই সভ্যতা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে এবং তত্ত্বগতভাবেও টিকে থাকতে পারবে না। সুতরাং সর্ব প্রথম যে সংস্কার প্রয়োজন তা হলো বিশ্ববিদ্যালয় অংগনে একটি প্রাণবন্ত ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করা। এখানে শিক্ষাদান এমনভাবে হওয়া উচিত যা মুসলমানদের নবীন বংশধরদেরকে নিজেদের জাতীয় সভ্যতা নিয়ে গর্ব করতে শেখাবে। তাদের মধ্যে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি মর্যাদাবোধ বা গভীর অনুরাগ সৃষ্টি করবে। তাদের মধ্যে ইসলামী চরিত্র ও উন্নত

জীবনবোধের প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টি করবে, তাদেরকে এমন যোগ্য করে গড়ে তুলবে যা তাদেরকে জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও পরিশীলিত চিন্তাশক্তি দ্বারা নিজের জাতীয় তমুদ্দুনকে রুচি ও শিষ্টাচারের উচচতম শিখরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

(২) শিক্ষাংগনে ইসলামী চেতনা ও প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টি বেশীরভাগ নির্ভর করে শিক্ষকদের জ্ঞান ও তার বাস্তব অনুশীলনের ওপর। যে শিক্ষকের নিজের মধ্যেই এ চেতনা নেই বরং সে চিন্তা ও কর্মে এর বিরোধী, এরূপ শিক্ষকের অধীনে থেকে শিক্ষার্থীর মন-মগজে কি করে ইসলামী চেতনা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হতে পারে? আপনি বিল্ডিংয়ের নক্শা বা প্লান তৈরী করতে পারেন মাত্র, কিন্তু আসল নির্মাতা তো আপনি নন। আসল নির্মাতা হলেন শিক্ষক স্টাফের সদস্যগণ। ফিরিংগী রাজ মিস্ত্রীরা ইসলামী নক্শা অনুযায়ী বিল্ডিং তৈরী করবে এই আশা করা উচেছ গাছে আঙুর গুচছ আশা করার নামান্তর। অন্যান্য বিষয় শিক্ষাদানের জন্য অ-মুসলিম বা অ-ইসলামী চিন্তা ধারার অধিকারী মুসলিম নামধারী শিক্ষক নিয়োগ করে শুধু দ্বীনিয়াত পড়ানোর জন্য কয়েকজন মৌলবী নিয়োগ করা একেবারেই নিরর্থক। কারণ ঐসব শিক্ষক জীবন এবং তার সমস্যা ও বাস্তব কাজকর্মের ক্ষেত্রে ছাত্রদের ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু থেকে সরিয়ে দেবে এবং শুধু দ্বীনিয়াতের কোর্স সংযোজনের দ্বারা এ বিষের বিষনাশক সরবরাহ করা যাবে না। সুতরাং দর্শন কিংবা বিজ্ঞান হোক, অর্থনীতি কিংবা আইন হোক অথবা ইতিহাস বা অন্য কোন বিষয় হোক, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার জন্য কোন ব্যক্তির বিশেষজ্ঞ হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং তার পাকা মুসলমান হওয়া জরুরী। বিশেষ অবস্থার কারণে যদি কোন অ-মুসলিম বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতেও হয় তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু সাধারণ নীতি এমন হবে যাতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ বিশেষজ্ঞ হওয়া ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য তথা ইসলামী সংস্কৃতির জন্য ধ্যান-ধারণা ও কাজ কর্ম উভয় বিচারেই উপযুক্ত বিবেচিত হন।

(৩) আরবী মুসলিম সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও প্রতীক ভাষা। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় আরবীকে বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ইসলামের মূল উৎসের সাথে যোগাযোগের জন্য এটাই একমাত্র মাধ্যম। মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণী যতদিন পর্যন্ত কোন মাধ্যম ছাড়াই কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান আহরণ করতে না পারবে, ততদিন পর্যন্ত তারা ইসলামের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পারবেনা। তাদের পক্ষে ইসলাম সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ ও সম্ভব

হবে না। সূতরাং সব সময়ই তাদেরকে অনুবাদক ও টীকাকারদের উপর নির্ভর করতে হবে। এভাবে তারা সরাসরি সূর্য থেকে সূর্যের আলো লাভ করতে পারবেনা। বরং বিভিন্ন রকম রঙিন গ্লাসের মাধ্যমে সূর্যের আলো পেতে থাকবে। বর্তমানে আমাদের মুসলিম সমাজের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ইসলামী বিষয়ে এমন সব ভুল ভ্রান্তি করছেন যা দেখে বুঝা যায়, তারা ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান পর্যন্ত রাখেন না। এর কারণ হলো সরাসরি কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে জ্ঞান আহরণের কোন সুযোগ তাদের নেই। ভবিষ্যতে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন অর্জিত হলে ভারতবর্ষের আইন সভা আইন প্রণয়নের জন্য অধিক ব্যাপক এখতিয়ার লাভ করবে এবং সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য নতুন নতুন আইন-কানুন রচনার প্রয়োজন হবে, তখন যদি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং পাশ্চাত্যের নৈতিক, সামাজিক ও আইনগত ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী ও আস্থাবান লোক আইন সভায় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে তাহলে নতুন নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মুসলমানদের সামাজিক পূণর্গঠনের পরিবর্তে বরং উল্টো সামাজিক বিকৃতি ঘটবে এবং মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা তার মূলনীতি থেকে আরো দূরে সরে যাবে। সূতরাং আরবী শিক্ষাদানের বিষয়টাকে শুধু ভাষা শিক্ষাদানের ব্যাপার মনে করা যাবে না। বরং মনে করতে হবে, এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত। আর যা মৌলিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সম্পৃক্ত তা শেখানোর জন্য সুযোগের অপেক্ষা করা যেতে পারে না। বরং তার জন্য সর্বাবস্থায় সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহে প্রাথমিক জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ক) **আকায়িদঃ** এ পর্যায়ে এ বিষয়টি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় জটিলতার নিরস বিস্তারিত আলোচনা পরিহার করতে হবে। এক্ষেত্রে বরং ঈমানিয়াত সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীর হৃদয়ঙ্গম করাতে হবে যা স্বাভাবিক অনুভূতি ও বুদ্ধি-বিবেকের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। ইসলাম যে সব বিষয়ের প্রতি ঈমান পোষণ করতে বলে তা যে আসলে বিশ্ব জাহানে মৌলিক সত্য ছাড়া আর কিছু নয় আর এসব বিষয়গুলো যে আমাদের জীবনের সাথে অটুট বন্ধনে বাঁধা শিক্ষার্থীদের জন্য তা জানার অবকাশ সৃষ্টি করতে হবে।

(খ) **ইসলামী আখলাকঃ** এ বিষয়টি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কেবল নৈতিকতার তাত্ত্বিক ধারণা পেশ করলে চলবে না। বরং রসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের বাস্তব জীবন থেকে এমন কিছু ঘটনা নির্বাচিত করে তুলে ধরতে হবে, যা দ্বারা শিক্ষার্থীরা একজন মুসলমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ কি এবং একজন মুসলমানের জীবন কেমন তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

(গ) **ফিকাহ শাস্ত্রীয় বিধিমালাঃ** এ বিষয়টি শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে আল্লাহর হক, বান্দার হক এবং ব্যক্তি -জীবনের আচরণ সম্পর্কে ইসলামী আইনের এমন কিছু প্রাথমিক এবং প্রয়োজনীয় আহকাম তুলে ধরতে হবে যা জানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। তবে পুরনো ফিকাহ গ্রন্থসমূহের অনুসরণ করে কূপে ইঁদুর পতিত হলে কত বালতি পানি তুলে ফেলে পানি পবিত্র করতে হবে এ ধরনের টুকিটাকি ও বিস্তৃত বিষয় এতে না থাকাই উচিত। এসব বিষয়ের পরিবর্তে ইসলামী ইবাদত ও আহকাম সমূহের যৌক্তিকতা এর মূল স্পিরিট এবং এর উপযোগিতা যুক্তিসহ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা উচিত। তাদেরকে বরং জানার সুযোগ দেয়া উচিত যে ইসলাম ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের জন্য কি কর্মসূচী পেশ করে এবং এই কর্মসূচী কিভাবে একটি সৎ ও নিষ্কলুষ সমাজ গঠন করে?

(ঘ) **ইসলামী ইতিহাস ঃ** এ পর্যায়ে ইসলামী ইতিহাস শিক্ষাদানের পরিসর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবন-চরিত ও সাহাবায়ে কিরামের যুগ পর্যন্ত সীমিত থাকবে। ইসলামী ইতিহাস শিক্ষাদানের লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদেরকে নিজের আদর্শ ও জাতীয়তার উৎস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা এবং তাদের মনে সঠিক ইসলামী মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা।

(ঙ) **আরবিঃ** এ পর্যায়ে আরবি ভাষার নিছক প্রাথমিক জ্ঞান দান করতে হবে যা আরবি সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করবে।

(চ) **কুরআন ঃ** কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে এ স্তরে এতটুকু জ্ঞান দান করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী কুরআন শরীফ দেখে ভালোভাবে পড়তে পারে। সহজ সরল আয়াতগুলোকে কিছুটা বুঝতে পারে এবং কয়েকটা সূরা মুখস্থও করে নিতে পারে।

কলেজ স্তরের শিক্ষা

কলেজ স্তরে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ পাঠ্যসূচী থাকবে যা সব শিক্ষার্থীকে পড়ানো হবে। এই পাঠ্যসূচীতে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো থাকবে ঃ

(ক) **আরবি** ঃ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আরবি সাহিত্য সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দান করতে হবে। কিন্তু বি.এ. বা স্নাতক পর্যায়ে গিয়ে এ বিষয়টাকে কুরআন শিক্ষার সাথে একীভূত করে নিতে হবে।

(খ) **কুরআন** ঃ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীকে কুরআন বুঝার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। এই স্তরে কয়েকটা বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়ে নিতে হবে। তা হলো কুরআন মজীদের সু-সংরক্ষিত হওয়া এবং ঐতিহাসিকভাবে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হওয়া, আল্লাহর ওহী হওয়া, সমস্ত ধর্মগ্রন্থের তুলনায় এর মর্যাদা, নজীর বিহীন বিপ্লবী শিক্ষা এবং তার প্রভাব শুধু আরবদের ওপর নয় বরং দুনিয়ার ধ্যান-ধারণা ও জীবন প্রণালীর ওপর এর বাচনভঙ্গি ও যুক্তি ধারা এবং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সারকথা।

বি.এ. স্তরে মূল কুরআন শিক্ষা দিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা পদ্ধতি হবে এমন যাতে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজেই কুরআন মজীদ পড়ে বুঝতে চেষ্টা করবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ শুধু জটিল বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে বুঝাবেন, প্রশ্নের জবাব দেবেন এবং সন্দেহ নিরসন করবেন। যদি বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং খুঁটিনাটি আলোচনা পরিহার করা হয়, তাহলে দু বছরের মধ্যেই অতি সহজেই পুরো কুরআন মজীদ পড়ানো সম্ভব হবে।

(গ) **ইসলামী শিক্ষা** ঃ এ বিষয়টি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে গোটা ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কেই অবহিত করাতে হবে। কি কি মৌলিক ধ্যান-ধারণার উপরে ইসলামের বুনিয়াদ রচিত হয়েছে, সে সব ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে ইসলাম আখলাক ও চরিত্র কিভাবে গঠন করে এবং এর অধীনে সমাজ জীবনে লেনদেন, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কোন্ নীতিমালা অনুসারে বিন্যস্ত করে, তা অনুধাবন করাতে হবে। এর সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি এবং সমষ্টির মধ্যে অধিকার ও কর্তব্য কিভাবে কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হুদুদুল্লাহ বা আল্লাহর দেয়া আদেশ-নিষেধ কি এবং এই আদেশ নিষেধের মধ্যে অবস্থান করে একজন মুসলমান চিন্তা ও কাজে কতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করবে, আর এই আদেশ নিষেধের গন্ডির বাইরে পদার্পণ করলে ইসলামী বিধানের উপর তার কি কি প্রতিক্রিয়া হয় এ সব বিষয় অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও সুবিন্যস্তভাবে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তা চার বছরের শিক্ষা-স্তরে ভারসাম্যপূর্ণভাবে বন্টন করতে হবে।

সাধারণ বাধ্যতামূলক বিষয়গুলো ছাড়াও ইসলামী বিষয়গুলোকে ভাগ করে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞ তৈরীর কোর্সসমূহে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং প্রত্যেক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল ইসলামী বিষয়কে তার অঙ্গীভূত করতে হবে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবকিছুই যথাস্থানে কল্যাণপ্রসূ। তাই এর কোনটার সাথেই ইসলামের শত্রুতা নেই। বরং আমি এতটুকু ইতিবাচক কথা বলতে চাই যে, জ্ঞানগত বাস্তবতা থাকলে ইসলাম ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান পরস্পরের বন্ধু। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যে কোন বৈরিতা নেই। বৈরিতা হলো ইসলাম ও পাশ্চাত্যপনার মধ্যে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকাংশ শাখায় পাশ্চাত্যবাসীরা বিশেষ কিছু মৌলিক ধারণা, স্বতঃসিদ্ধ কল্পনা, কিছু সূচনা-বিন্দু (Starting Points) এবং কিছু বিশেষ দৃষ্টিকোণ পোষণ করে যা প্রকৃতপক্ষে কোন প্রমাণিত বিষয় না। বরং ঐগুলো তাদের নিছক বিশেষ মানসিকতা মাত্র। তারা জ্ঞানলব্ধ বাস্তবতাকে ঐ বিশেষ মানসিকতার ছাঁচে ঢেলে তদানুযায়ী ঐগুলোকে বিন্যস্ত করে একটি বিশেষ নীতিমালা বা আদর্শিক রূপদান করে থাকে। ইসলামের বৈরিতা ঐ বিশেষ মানসিকতার সাথে। ইসলাম বাস্তবতার দুশমন নয়। বরং এই বিশেষ ধাঁচের মানসিকতার দুশমন, জ্ঞান লব্ধ বাস্তবতাকে যে মানসিকতার আদলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কারণ ইসলাম একটি লক্ষ্য কেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা, একটি দৃষ্টিকোণ, চিন্তাধারার সূচনা-বিন্দু এবং বিশেষ মানসিকতা পোষণ করে যা মৌলিক ও প্রকৃতিগত দিক থেকে পাশ্চাত্য ধাঁচের সম্পূর্ণ বিরোধী। এখন একটা কথা ভাল ভাবে বুঝে নিন। তাহলো পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাস্তবতাকে গ্রহণ করাটাই ইসলামের দৃষ্টিতে গোমরাহীর মূল কারণ নয়। বরং গোমরাহীর মূল কারণ হলো আপনি পাশ্চাত্যের নিকট থেকেই তাদের বিশেষ ধাঁচের মানসিকতা হুবহু গ্রহণ করছেন। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, আইন-কানুন, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য সব বিভাগেও আপনি নিজেই নবীন সরলমতি শিক্ষার্থীদের মন-মগজে পাশ্চাত্যের মৌলিক ধ্যান-ধারণা ঢুকিয়ে দিচেছন। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদেরকে সব কিছু দেখতে শেখাচেছন, পাশ্চাত্যের অনুমান নির্ভর বিষয়গুলোকে তাদের সামনে সর্ববাদী সম্মত সত্য

হিসেবে পেশ করছেন, যুক্তি প্রমাণ ও যাচাই বাছাইয়ের জন্য পাশ্চাত্যবাসীদের গৃহীত সূচনাবিন্দুকেই মানদন্ড হিসেবে পেশ করছেন এবং যাবতীয় জ্ঞানলব্ধ বাস্তবতা ও সমস্যাবলীকে পাশ্চাত্যবাসী যে ভঙ্গিতে বিন্যস্ত করে থাকে আপনি ঠিক সেই ভাবেই বিন্যস্ত করে শিক্ষার্থীদের মন-মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করিয়ে দিচেছন। আর এসব কিছু করার পর আপনি চাচেছন, শুধু দ্বীনিয়াত বিষয়টি তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে দিক। এটা কি করে সম্ভব? যে দ্বীনিয়াত বিভাগে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়, জ্ঞানগত বাস্তবতা ও জীবন-সমস্যা সমাধানে যার কোন বাস্তব প্রয়োগ নেই। বরং এ সব তাত্ত্বিক জ্ঞান যদি শিক্ষার্থী কর্তৃক লব্ধজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত হয় তাহলে সেই দ্বীনিয়াত বিভাগ কি করতে পারে? গোমরাহীর মূল উৎস এখানেই। যদি আপনি এই গোমরাহীর পথ রোধ করতে চান তাহলে উৎসমুখেই এর গতিপথ পাল্টিয়ে দিন বরং এমন সূচনা বিন্দু, দৃষ্টিকোণ ও মৌলিক নীতি দিয়ে শুরু করুন যা কুরআন থেকে আপনি লাভ করছেন। যখন সব রকমের লব্ধজ্ঞান এই প্রজ্ঞা-কাঠামোর অধীনে সন্নিবিষ্ট ও বিন্যস্ত হবে এবং সেই দৃষ্টিতেই গোটা বিশ্ব-জাহান ও জীবন সমস্যার সমাধান করা হবে, তখনই মাত্র আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুসলমান ছাত্র হবে। আর তখনই আপনি বলতে পারবেন আমরা তাদের মধ্যে ইসলামী স্পিরিট বা প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। অন্যথায় শুধু একটি বিভাগে ইসলাম আর অন্যসব কটি বিভাগে অ-ইসলামী শিক্ষা বহাল রাখার পরিণাম এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, এখান থেকে সনদ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা দর্শন শিক্ষার ক্ষেত্রে অ-মুসলিম, রাজনীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে অ-মুসলিম, ইতিহাস-দর্শন শিক্ষার ক্ষেত্রে অ-মুসলিম এবং অর্থনীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে অ-মুসলিম হয়ে গড়ে উঠবে। আর তাদের কাছে ইসলাম হবে নিছক কিছু আকীদা-বিশ্বাস ও কিছু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ।

বিশেষ পাঠক্রম

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ বিভাগগুলোকে আলাদাভাবে শিক্ষা দেয়ার দরকার নেই। এর প্রত্যেকটিকে একই ধরনের পাশ্চাত্য বিষয়ের শেষ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া উচিত যেমন ' ইসলামী দর্শন' ইসলামী দার্শনিক চিন্তাধারার

বিকাশে মুসলমানদের অবদান এবং ইসলামী হিকমতকে দর্শন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস দর্শনকে ইতিহাস বিভাগে, ইসলামী আইনের মূলনীতি এবং ফিকাহ শাস্ত্রের ব্যবহারিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত অধ্যায় ও অনুচেছদ সমূহকে আইন বিভাগে, ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিসমূহ ও অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত ফিকাহ শাস্ত্রীয় অধ্যায় সমূহকে অর্থনীতি বিভাগে এবং ইসলামী রাজনৈতিক মতবাদ সমূহ, ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং দুনিয়ার রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশে ইসলামের অবদানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে আন্তর্ভুক্ত করা উচিত। অন্যান্য বিষয়ও একইভাবে পাশ্চাত্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

গবেষণা ও ডক্টরেট বিভাগ

এই পাঠক্রমের পর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচচতর গবেষণার জন্য একটা বিশেষ বিভাগ থাকা উচিত। এ বিভাগ থেকে পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মত উচচতর তাত্ত্বিক গবেষণার জন্য ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এ বিভাগ থেকে তৈরী হবে এমন সব লোক যারা জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে মৌলিক ও স্বাধীন প্রক্রিয়া অনুসরণের ট্রেনিং লাভ করবে। অতঃপর তারা শুধু মুসলমানদের নয় বরং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সারা দুনিয়ার তাত্ত্বিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।

প্রস্তাবিত ইসলামী শিক্ষা-পদ্ধতি বাস্তবায়নের পন্থা

আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি নয়া শিক্ষাব্যবস্থার যে নীল নকশা পেশ করছি তা আপাতঃ দৃষ্টিতে কার্যোপযোগী বলে মনে নাও হতে পারে। কিন্তু অনেক চিন্তা গবেষণার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, গভীর মনোনিবেশ, যথোপযুক্ত পরিশ্রম ও পর্যাপ্ত অর্থব্যয়ে এ কর্মসূচীকে ক্রমান্বয়ে কার্যকরী করা সম্ভব।

কোন একটা নতুন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রথম পদচারণা করা মাত্রই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে এরূপ মনে করা কখনো উচিত নয়। আর কাজ শুরু করার জন্য তার পূর্ণতা সাধনের উপায়-উপকরণ আগে থেকেই হাতে নিয়ে নামতে হবে এটাও জরুরী নয়। এ মুহূর্তে শুধু মাত্র ভবনের ভিত্তি স্থাপনই জরুরী এবং তার উপায়-উপকরণ এখন হাতের নাগালের ভেতরেই আছে। এই নীল নকশা অনুসারে নয়া শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করার মত কারিগর বর্তমান বংশধরদের মধ্যেই আছে। অতঃপর এই বংশধরদের কাছ থেকে শিক্ষা ও ট্রেনিং পেয়ে যে বংশধর তৈরী করা হবে তারা এই ভবনের দেয়াল গেঁথে তুলবে। তারপর তৃতীয় বংশধররা এমন হবে যাদের হাতে ইনশাআল্লাহ এর নির্মাণ কাজ পূর্ণতা লাভ করবে।

উৎকর্ষ ও পূর্ণতার যে স্তর কমপক্ষে তিনটে বংশধরদের অব্যাহত চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা উত্তরণ সম্ভব, তা আজই উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তৃতীয় বংশধরদের হাতে এ কাজের পূর্ণতা লাভ নিশ্চিত করতে হলে আজই এ কাজ শুরু করা প্রয়োজন। নচেত পূর্ণতার স্তর অনেক দুরে বলে আজ এ কাজ শুরু করার যাবতীয় উপায়-উপকরণ হাতে থাকা সত্ত্বেও যদি শুরু করা না হয়, তাহলে একাজ কোন কালেও সম্পন্ন হবে না।

যেহেতু এই সংস্কারমূলক পদক্ষেপের পরামর্শ আমিই দিচ্ছি, তাই এর বাস্তবায়ণের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করার দায়িত্বও আমার উপরই বর্তায়। এ জন্য আলোচনার এই অংশে আমি এ শিক্ষা পদ্ধতির বাস্তবায়ণ কিভাবে শুরু করা যেতে পারে সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে চাই।

১- মাধ্যমিক স্কুলে ইসলামী আকীদা, আখলাক ও শরীয়তের বিধি নিষেধ সম্বলিত একটা পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রম সম্প্রতি হায়দারাবাদের নিযাম সরকার কর্তৃক রচিত হয়েছে। তা প্রয়োজনীয় রদবদল ও সংশোধন দ্বারা কার্যোপযোগী করা যেতে পারে।

প্রাচীন পদ্ধতিতে পড়ানোর কারণে আরবী ভাষা শিক্ষা যেরকম জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে সে অবস্থা এখন আর নেই। মিশর, সিরিয়া এবং খোদ্ উপমহাদেশেও

এখন আরবী শিক্ষার সহজতর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। আরবী শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানগত ও বাস্তব দক্ষতা রাখেন এমন লোকদের নিয়ে একটা কোর্স তৈরী করা উচিত যাতে কুরআনকেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আরবী শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এতে কুরআন শিক্ষার জন্য আলাদা সময় ব্যয় করতে হবে না। প্রথম থেকেই কুরআনের সাথে ছাত্রদের কিছুটা ঘনিষ্টতা গড়ে উঠবে।

ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে এদেশীয় ভাষায় বিস্তর বই লেখা হয়েছে। সেগুলো যোগাড় করে পড়ে দেখা দরকার। যেসব বই উপযোগী বলে মনে হবে, তা প্রাথমিক শ্রেণীগুলোতে পাঠ্য হিসেবে চালু করা যেতে পারে।

ইসলামিয়াত ও আরবী এ দুটো বিষয়ের জন্য দৈনিক মাত্র এক ঘন্টা যথেষ্ট হবে। এরপর আসে ইসলামের ইতিহাসের কথা। এর জন্য কোন আলাদা সময়ের দরকার হয় না। সাধারণ ইতিহাসের পাঠ্যসূচীতে একে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এভাবে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় বড় রকমের কোন পরিবর্তনের দরকার হবে না। পরিবর্তন যেটুকু দরকার হবে তা শিক্ষাসূচী, শিক্ষা দানের পদ্ধতি এবং শিক্ষকের গুণগত মানের ক্ষেত্রে। দ্বীনিয়াতের শিক্ষা এবং শিক্ষক সম্পর্কে এ যাবত যে ধারণা পোষণ করে আসা হচেছ সে ধারণা ত্যাগ করতে হবে। এ যুগের ছাত্র-ছাত্রীর বুদ্ধিবৃত্তি ও মনস্তত্ব বুঝতে পারেন এমন শিক্ষক নিয়োগ করা চাই। তাদেরকে এই পরিবর্তিত ও উন্নত মানের শিক্ষাসূচী দিতে হবে এবং সেই সাথে শিক্ষাংগনের পরিবেশটাকে এতটা ইসলামী ভাবাপন্ন করে গড়তে হবে যে, সেখানে যেন ইসলামী ভাবধারার বীজ বপন করা হলে তার অঙ্কুরোদগম সম্ভব হয়।

২- উচচ মাধ্যমিক স্তরের জন্য আমি যে সাধারণ পাঠ্যসূচীর প্রস্তাব দিচ্ছি তা তিনটি অংশে বিভক্ত। আরবী, কুরআন ও ইসলামী শিক্ষা। এর মধ্যে আরবীকে মাধ্যমিক স্তরে বাধ্যতামূলক ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন ভাষা শিখতে চাইলে ছাত্ররা গৃহ শিক্ষক রাখবে। কিন্তু কলেজে যে ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে থাকবে, সেটা ছাড়া আর কোন ভাষা যদি বাধ্যতামূলক হয় তবে তা একমাত্র আরবীই হওয়া উচিত। যদি পাঠ্যক্রম ভালো হয় এবং শিক্ষক খুব অভিজ্ঞ হন তাহলে উচচ মাধ্যমিক স্তরের দুই বছরেই ছাত্ররা এতটা যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবে যে, বি. এ. ক্লাসে পৌছে কুরআনের শিক্ষা স্বয়ং কুরআনের ভাষাতেই অর্জন করতে পারবে।

কুরআন শিখবার জন্য তাফসীরের কিতাব দরকার হয় না। একজন উঁচু মানের অধ্যাপকই যথেষ্ট। অধ্যাপক এমন হওয়া চাই যিনি কুরআনকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়েছেন এবং নতুন পদ্ধতিতে কুরআন পড়ানো ও বুঝানোর যোগ্যতা

রাখেন। তিনি অধ্যাপনার মাধ্যমে উচচ মাধ্যমিক ছাত্রদের মধ্যে কুরআন বুঝাবার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা গড়ে তুলবেন। তারপর বি. এ. ক্লাশে তাদেরকে সমগ্র কুরআন শরীফ এমনভাবে পড়িয়ে দেবেন যে, তারা আরবী ভাষায়ও উন্নতি লাভ করবে আর ইসলামের তাৎপর্যও ভাল করে বুঝে নেবে।

'ইসলামী শিক্ষার' জন্য একখানা নতুন পাঠ্য বই লেখানোর দরকার। এ বই এর বিষয়বস্তুর বিন্যাস কেমন হবে সে কথা আমি ইতিপূর্বে উচচ মাধ্যমিক স্তরের ইসলামী শিক্ষার পর্যায়ে বিশ্লেষণ করেছি। আমি নিজে "ইসলামী তাহযীব আওর উসকে উসূল ও মাবাদী" নামে একখানা বই এ উদ্দেশ্যেই লিখেছি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উপযোগী মনে করলে এ বই তাদেরকে দিয়ে দেব।

এ বিষয়গুলো শিক্ষা দিতে কলেজের বর্তমান রুটিনে পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। মাধ্যমিক স্তরের ভাষার জন্য বর্তমানে যেটুকু সময় বরাদ্দ আছে, আরবীর জন্য সেটুকুই যথেষ্ট হবে। কুরআন ও ইসলামী শিক্ষার জন্য বর্তমানে ধর্মীয় শিক্ষার সময়টাই পালাক্রমে ভাগ করে দিলে চলবে।

৩- উচচ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিশেষ ও ঐচিছক শিক্ষা সূচীর ক্ষেত্রে এবং উচচতর শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি যে সুপারিশ করেছি তার বাস্তবায়নই সব চেয়ে জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে। এ সমস্যা সমাধানের তিনটে পন্থা আছে যা ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক) আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহ্তেও ভালো দখল রাখেন এমন অধ্যাপক খুঁজতে হবে। (এ ধরনের অধ্যাপক একেবারে দুর্লভ নয়।) পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যাবলীকে ইসলামী মতাদর্শের আলোকে পুনর্বিন্যস্ত করতে পারেন এমন যোগ্যতা তাদের মধ্যে থাকা চাই।

খ) ইসলামী আইন দর্শন, আইন শাস্ত্রের মূলনীতি ও আইন তত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে আরবী, উর্দু, ইংরেজী, জার্মান ও ফারসী ভাষায় যে সব বই পুস্তক রয়েছে, তা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত। যে সব বই হুবহু গ্রহণ করার মত তা পাঠ্য হিসেবে নির্বাচিত করা উচিত। আর যে সব বই কিঞ্চিৎ রদবদল অথবা সংকলণ করে কাজে লাগানো সম্ভব সেগুলো সেভাবে কাজে লাগাতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞদের একটা গ্রুপকে নিয়োজিত করতে হবে।

গ) উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়ে নতুন বই পুস্তক রচনা করার জন্য কিছু সংখ্যক ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন লেখককে নিয়োজিত করতে হবে। বিশেষত ফিকাহ শাস্ত্র, ফিকাহ্ শাস্ত্রের মূলনীতি, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামের সমাজ বিজ্ঞান ও কুরআনে আলোচিত বিজ্ঞান দর্শন সম্পর্কে নতুন বই পুস্তক লেখা অত্যন্ত জরুরী । পুরনো

গ্রন্থাবলীগুলো এখন পাঠ্য পুস্তক হিসেবে অকেজো হয়ে পড়েছে। অবশ্য গবেষকগণ ঐ সব গ্রন্থে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন। কিন্তু ঐগুলো হুবহু পাঠ্য করে এ যুগের ছাত্রদের পড়ানো একেবারেই নিরর্থক। এ কথা সত্য যে, এই মুহূর্তে উল্লেখিত তিনটি পন্থার সব ক'টা প্রয়োগ করেও আমাদের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সিদ্ধ হবে না। আর এই সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজে বেশ কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যাবে এটাও নিশ্চিত। তবে এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এটা হবে সঠিক পথের প্রথম পদক্ষেপ। এতে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাবে তা পরবর্তী বংশধরগণ শুধরে নেবে। হয়তো বা এই পূর্ণতা লাভের প্রক্রিয়ায় ৫০ বছরও লেগে যেতে পারে।

৪- ইসলামী গবেষণা বিভাগ প্রতিষ্ঠার সময় এখনো আসেনি। এর সুযোগ আসবে আরো পরে। সুতরাং এ মুহূর্তে সে সম্পর্কে কোন প্রস্তাব পেশ করা নিরর্থক।

৫- আমার সুপারিশগুলো মোটামুটিভাবে মুসলমানদের সকল ফেরকা বা মাযহাবের লোকদের জন্যই গ্রহণযোগ্য। তা সত্ত্বেও শীয়া উলামাদের মতামত নেয়া উচিত। তারা যদি শীয়া ছাত্রদের জন্য আলাদা কোন শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করতে চান করতে পারেন। তবে যতদূর সম্ভব, শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মতভেদগুলো এড়িয়ে যাওয়াই সঙ্গত। মত ও পথ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের নতুন বংশধরদের ইসলামের সর্বসম্মত মূলনীতিগুলোর প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত।

৬- স্যার মুহাম্মাদ ইয়াকুবের এই মত আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি যে, বড় বড় মুসলিম পন্ডিতদেরকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ভাষণ দেয়ার জন্য মাঝে মাঝে দাওয়াত দেয়া উচিত। সত্যি বলতে কি, আমার একান্ত বাসনা, আলীগড় শুধু ভারতবর্ষের নয় বরং সারা ভারতের মুসলিম জাহানের কেন্দ্রীয় বিদ্যাপীঠ এবং বুদ্ধি চর্চা কেন্দ্রে পরিণত হোক। ভারতবর্ষের বড় বড় জ্ঞানী-গুনীগণ ছাড়াও মিশর, সিরিয়া, ইরান, তুরস্ক ও ইউরোপের মুসলিম মনীষিদেরকে মাঝে মাঝে দাওয়াত দিয়ে আনা উচিত যেন তারা তাদের মূল্যবান মতামত, চিন্তা-গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফল পেশ করে আমাদের ছাত্রদের চিন্তাধারাকে আলোকিত ও উজ্জীবিত করে তোলেন এবং তাদের মধ্যে নতুন প্রেরণা ও উদ্যমের সঞ্চার করেন। এ ধরনের ভাষণসমূহ পর্যাপ্ত সম্মানী দিয়ে লেখানো বাঞ্ছনীয় যাতে তারা প্রচুর সময়, শ্রম ও চিন্তা গবেষণা দ্বারা লিখতে পারেন এবং এ সব ভাষণ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য নয়, বরং সাধারণ শিক্ষিত লোকদের জন্যও কল্যাণকর হতে পারে।

৭- ইসলামী শিক্ষার জন্য কোন একটি মাত্র ভাষাকে নির্দিষ্ট করে নেয়া ঠিক নয়। কেননা কোন একটি ভাষাতেই ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ যথেষ্ট

পরিমাণে নেই। তাই আপাতত যে ভাষাতেই কোন দরকারী জিনিস পাওয়া যাবে, তাকে সেই ভাষাতেই পড়িয়ে দিতে হবে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষকদের সবারই আরবী ও ইংরেজী উভয় ভাষায় ভালো জ্ঞান থাকা চাই। এ যুগে কোন একটিমাত্র ভাষাভিজ্ঞ লোক ভালো ইসলামী শিক্ষক হতে পারে না।

আমি দীর্ঘ কয়েক বছর ব্যাপী চিন্তা গবেষণার পর এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, শিক্ষাব্যবস্থার সর্বাত্মক পরিবর্তন সূচিত করা ছাড়া জাতি হিসেবে মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার আর কোন উপায় নেই। সেই সর্বাত্মক পরিবর্তন আমার এ প্রস্তাবগুলো অনুসারেই হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। আমি জানি আমার এ চিন্তা ধারাকে অনেকেই পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন। এরূপ মনে করলে আমি এতে বিস্মিত হবো না। কেননা যাদের দৃষ্টি পশ্চাদমুখী তারা অধিকাংশ সময় সম্মুখে দৃষ্টি দানকারীদের পাগলই ভেবে থাকে। এ রকম ভাবাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যে অনিবার্য পরিণতি আমি দেখতে পাচ্ছি, তা তারাও নিজ চর্ম চোখেই দেখতে পাবেন সেদিন বেশী দূরে নয়। হয়তো বা আমার জীবদ্দশাতেই। তখন তারাও এই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেন। কিন্তু তখন বন্যার প্রবাহ মাথার উপর দিয়ে বইতে থাকবে। পরিস্থিতি শোধরানোর সুযোগ তখন হয়তো থাকবে না।

সনদ-বিতরণী সভার ভাষণ

[একবার কোন এক ইসলামিয়া কলেজের সনদ বিতরণী সভায় মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে ভাষণ দেয়ার জন্য দাওয়াত করা হয়। সে অনুষ্ঠানে তিনি যে বক্তব্য পেশ করেন তা সর্ব শ্রেণীর মানুষের উপকারার্থে এখানে উল্লেখ করা হলো।]

সম্মানিত অধ্যাপকবৃন্দ, সমবেত ভদ্র মন্ডলী ও প্রিয় ছাত্রগণ, আপনাদের এই সনদ বিতরণী সভায় আমি নিজে কিছু বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পেয়ে সত্যিই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমার এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নেহায়েত আনুষ্ঠানিকতা নয় বরং সম্পূর্ণ বাস্তব। আর গভীর আন্তরিকতা নিয়েই আমার এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। কেননা যে শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে আপনাদের এই মহতী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং যেখানে শিক্ষা লাভ করে আপনাদের উত্তীর্ণ ছাত্ররা সনদ গ্রহণ করতে চলেছে আমি তার কট্টর দুশমন। আমার সে দুশমনীর কথা আমাকে যারা চেনেন তাদের অজানা নয়। ব্যাপারটা জানা থাকা সত্ত্বেও আমাকে যখন এ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেয়ার জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছে, তখন দাওয়াত দানকারীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করা আমার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। যে ব্যক্তি তাদের মত ও পথের শত্রু, তার কথা শোনার মত উদারতা যাদের মনে রয়েছে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও মর্যাদার অনুভূতিতে আমার হৃদয়-মন ভরে উঠবে এটা স্বাভাবিক। বিশেষ করে আপনারা আমাকে এমন সময় ছাত্রদের সাথে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন যখন তারা এখান থেকে বেরিয়ে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচেছন। এজন্য আমি আরো বেশী কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত শ্রোতৃমন্ডলী, কিছুক্ষণের জন্য আপনাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আজ যারা এখান থেকে সনদ নিতে যাচেছন সেই স্নেহভাজন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য পেশ করার জন্য আমাকে অনুমতি দিন। কেননা সময় কম এবং আমার অনেক কথা বলার রয়েছে।

আমার প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!

আপনারা এখানে জীবনের বেশ কটি মূল্যবান বছর কাটিয়ে শিক্ষা লাভ করেছেন। এতদিন বুকভরা আশা নিয়ে আপনারা আপনাদের পরিশ্রমের ফসল হিসেবে ডিগ্রী লাভের এই শুভ মুহূর্তটার প্রতীক্ষায় ছিলেন। এই শুভ মুহূর্তে আপনাদের আবেগ অনুভূতি যে কত গভীর হতে পারে তা আমি ভালো করেই

উপলব্ধি করতে পারি। আর এ কারণেই আপনাদের সামনে নিজের মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে গিয়ে আমি বিশেষভাবে দুঃখ অনুভব করছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি যে কথা সত্য বলে জানি এবং যে সম্পর্কে আপনাদেরকে এক্ষণি অবহিত করা আমি জরুরী মনে করি, তা যদি কেবল আবেগ অনুভূতির দিকে লক্ষ্য করে নিছক লৌকিকতার খাতিরে না বলি তাহলে সেটা হবে আমার মারাত্মক অন্যায়। কেননা আপনারা জীবনের একটি স্তর অতিক্রম করে অন্য স্তরের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

সত্যি বলতে কি, আমি আপনাদের এই শিক্ষাঙ্গনকে এবং বিশেষ করে এটি নয় বরং এ ধরনের অন্য সব শিক্ষাঙ্গনকেও শিক্ষাঙ্গনের পরিবর্তে বধ্যভূমি বলে মনে করি। আমার দৃষ্টিতে এখানে সত্যিই আপনাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। আর যে সনদ আপনারা লাভ করেছেন সেগুলো আসলে আপনাদের মৃত্যুর সার্টিফিকেট (Death Certificates)। হত্যাকারী নিজের ধারণায় আপনাদের মৃত্যু সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার পরই এ সার্টিফিকেট আপনাদের দিতে যাচ্ছে। এরূপ সুসংগঠিত বধ্যভূমি থেকেও যদি আপনারা প্রাণ বাঁচিয়ে যেতে পারেন তবে সেটা আপনাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। আমি এখানে এই মৃত্যু সার্টিফিকেট লাভের জন্য আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাতে আসি নি বরং কওমের একজন সদস্য হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই আপনাদের প্রতি যে সহানুভূতি আমার রয়েছে সেই অনুভূতিই আমাকে এখানে টেনে এনেছে। কোন নির্বিচার গণহত্যায় কারো আত্মীয়-স্বজন নিহত হলে সে যেমন লাশের স্তুপের ভেতর খুঁজতে থাকে কেউ এখনো প্রাণে বেঁচে আছে কিনা, আমার অবস্থাও তেমনি।

এ কথা কখনও মনে করবেন না যে, আমি অতিরঞ্জিত কিছু বলছি। সংবাদ পত্রের পাতায় আমি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে চাইনা। প্রকৃতপক্ষে এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এটাই আমার দৃষ্টিভঙ্গি। আমি যদি একটু বিস্তারিতভাবে আমার এ সিদ্ধান্ত উপনীত হবার কারণ বিশ্লেষণ করি তাহলে হয়তো বা আপনারাও আমার সাথে একমত না হয়ে পারবেন না।

আপনারা সবাই জানেন যে, একটা চারাগাছকে যদি তার জন্মস্থান থেকে উপড়ে নিয়ে এমন জায়গায় লাগান হয় যেখানকার আবহাওয়া, মাটি ও সমগ্র পরিবেশ তার জীবন ধারণের জন্য প্রতিকূল, তাহলে গাছটি শিকড় গজাতে সক্ষম হবে না। তবে যদি সেই জায়গায় কৃত্রিমভাবে তার আসল জন্মস্থানের অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু প্রতিটি চারা গাছ ল্যাবরেটরীর কৃত্রিম

পরিবেশ সারা জীবন পেতে পারে না। এই ব্যতিক্রমী অবস্থার কথা বাদ দিলে সাধারণভাবে এ সত্য কথাটি বলা চলে যে, কোন চারা গাছকে তার আসল জন্মস্থান থেকে উপড়ে একটা ভিন্ন ধরনের পরিবেশে নিয়ে লাগিয়ে দেয়া তাকে হত্যা করারই নামান্তর ।

এবার আরেকটি দুর্ভাগা চারা গাছের কল্পনা করুন। যে গাছটিকে তার জন্মস্থান থেকে উৎপাটিত করা হয় নি কিংবা তার জন্মগত পরিবেশ থেকেও উচেছদ করা হয় নি। তার মাটি, পানি, বাতাস ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অপরিবর্তিতই রয়েছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার নিজের ভেতরে এমন পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে যে, নিজের জন্মস্থান থেকেও তার প্রকৃতি সেখানকার মাটি, পানি, বাতাস ও পরিবেশ থেকে বিচিছন্ন ও সম্পর্কহীন হয়ে আছে। ফলে সে সেখানে শিকড় গজাতে ও সেখানকার পানি ও বাতাস থেকে খাদ্য আহরণ করতে পারছে না, আর ঐ পরিবেশে তার কলেবরও বাড়তে পারছে না। অভ্যন্তরীণ এই পরিবর্তনের ফলে চারাগাছটির অবস্থা ভিন্ন মাটি থেকে উপড়ে এনে ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি এবং কৃত্রিমভাবে বেঁচে থাকার উপকরণ সংগ্রহ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ল্যাবরেটরীর এই কৃত্রিম পরিবেশ যদি তাকে তৈরী করে দেয়া না হয় তাহলে সে যেখানে জন্মেছে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মাটি থেকে বিচিছন্ন হয়ে পড়বে এবং অচিরেই শুকিয়ে মরে যাবে।

প্রথম কাজটি অর্থাৎ একটা চারাগাছকে তার জন্মস্থান থেকে উপড়ে এনে নতুন ভিন্ন পরিবেশে রোপন করা একটি ছোটখাট জুলুম। তবে দ্বিতীয় কাজটি অর্থাৎ চারাগাছটিকে যেখানে জন্মেছে সেখানেই তার জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা নিঃসন্দেহে বড় রকমের জুলুম। আর যখন একটি দু'টি নয় লক্ষ লক্ষ চারা গাছের ক্ষেত্রে এরূপ করা হয় এবং এত বিপুল সংখ্যক চারাগাছকে ল্যবরেটরীর কৃত্রিম পরিবেশ যোগান দেয়াও সেখানে সম্ভব নয় তখন একে জুলুমের পরিবর্তে পাইকারী হত্যা বলা অতিরিক্ত হবে না।

আমি বাস্তব অবস্থার যে পর্যবেক্ষণ করেছি তাতে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনাদের সাথেও একই আচরণ করা হচেছ। আপনারা ভারত ভূমির মুসলমান সমাজে জন্ম গ্রহণ করেছেন। এখানকার মাটি, এই সমাজের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া ও পরিবেশেরই উৎপন্ন ফসল আপনারা। এই মাটিতে শিকড় গজানো এবং এই আবহাওয়া থেকেই জীবনী শক্তি আহরণ করা ছাড়া আপনাদের বেড়ে ওঠা ও ফুলে ফলে সুশোভিত হওয়ার আর কোন পথ নেই। এ পরিবেশের সাথে আপনাদের যত বেশী সখ্যতা ও সঙ্গতিশীলতা গড়ে উঠবে, ততই আপনাদের পরিপুষ্টি আসবে এবং বাগানের সৌন্দর্য সুষমা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা

কি? এখানে আপনারা যে শিক্ষা ও অনুশীলন লাভ করেছেন, যে মানসিকতা আপনাদের সৃষ্টি হচেছ, যে ধ্যান-ধারণা, যে প্রবণতা ও যে ইচ্ছা-আকাংখ্যা ও কামনা বাসনা আপনাদের মধ্যে লালিত হচেছ, যে আদব-অভ্যাস, রীতি-প্রথা, আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্র আপনাদের মধ্যে বদ্ধমূল হচেছ এবং যে চিন্তা-পদ্ধতি ও রুচিবোধ দিয়ে এবং যে জীবনধারায় আপনাদের গড়ে তোলা হচ্ছে, সে সব কিছু মিলে এ দেশের মাটি, আবহাওয়া ও সামাজিক পরিবেশের সাথে বিন্দুমাত্র ও সম্পর্ক থাকতে দেয় কি? এ দেশের সেই কোটি কোটি মানুষ যাদের মধ্যে আপনাদের বাঁচতে ও মরতে হবে এবং সে দেশের সমাজ জীবনে যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে রয়েছে তার সাথে এখানকার চাল-চলন, কথাবার্তা, লেবাস-পোশাক ও জীবন-রীতির কতখানি মিল আছে? এখানকার সামাজিক পরিবেশের সাথে আপনাদের যে কত বড় গড়মিল এবং আপনাদের জন্য এই সমাজ যে কত অসঙ্গত, আর এ অসঙ্গতির যন্ত্রণাও যে কত তীব্র, সেটা অনুভব করার মত সুস্থতাও যদি আপনাদের মধ্যে থাকতে দেয়া হতো, তা হলেও সেটা সৌভাগ্যের ব্যাপার হতো।

একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরো ভালো করে বুঝা যাবে। কাঁচামালের ওপর কারিগরী প্রক্রিয়া চালানো হয় তা ব্যবহারের উপযোগী দ্রব্যে পরিণত করার জন্য। কিন্তু যদি কোন কাঁচামালের ওপর কারিগরী প্রক্রিয়া চালানো সত্ত্বেও তা ব্যবহারের উপযোগী না হয়, তাহলে এ কাঁচামালটাও নষ্ট হলো, আর তার ওপর ব্যয়িত কারিগরী শ্রমও বৃথা গেল। কাপড়ের ওপর দর্জির কারিগরি যোগ্যতা এজন্য প্রয়োগ করা হয়, যাতে তা শরীরে ঠিকমত লাগে। এ উদ্দেশ্য সফল না হলে কারিগর দিয়ে কাপড়কে কেবল নষ্ট করাই সার হবে। একটা জিনিসের ওপর বাবুর্চিগিরীর বিদ্যা প্রয়োগ করা হয় তাকে খাবারে পরিণত করার জন্য। কিন্তু সেটা খাবারের যোগ্য না হলে বাবুর্চি ঐ জিনিসটাকে নষ্টই করল বলতে হবে।

অনুরূপভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো সমাজে যে সব মানুষগুলো জন্ম নিলো তাদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা ও যোগ্যতা এখনও অপরিপক্ক ও অপরিণত অবস্থায় রয়েছে সেগুলোকে সর্বোত্তম পন্থায় লালন পালন ও পরিপুষ্ট করে যে সমাজে তারা জন্ম গ্রহণ করেছে সেই সমাজের উপযোগী সার্থক সদস্য বানানো এবং ঐ সমাজের বিকাশ, কল্যাণ ও উন্নতির সহায়কে পরিণত করা। কিন্তু যে শিক্ষা ব্যক্তিকে সমাজ ও তার বাস্তব জীবন ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় সে শিক্ষা সম্পর্কে একথা বলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না যে, তা সমাজকে গঠন করে না বরং ধ্বংস করে। শিশু-কিশোর ও তরুণরা প্রত্যেক জাতির ভবিষ্যত ভাগ্যলিপি স্বরূপ। স্বাভাবিকভাবে এসব শিশু-কিশোর ও তরুণদের আগমন ঘটে। আল্লাহর তরফ

থেকে এ ভাগ্যলিপি অলিখিত পেটের আকারে এসে থাকে। জাতি নিজ হাতে ঐ পেটে তার ভবিষ্যত লিপিবদ্ধ করুক এই এখতিয়ার তাকে দেয়া হয়। কিন্তু আমরা এমন এক দুর্ভাগা জাতি যে, এই অলিখিত ভাগ্যলিপিতে নিজেদের ভবিষ্যত নিজেরা না লিখে অন্যদের হাতে তুলে দেই। এতে তারা তাদের ইচেছমত যা খুশি লিখে দিক, এমনকি আমাদের মৃত্যু পরোয়ানাও যদি লিখে দেয় তবুও যেন আমাদের কিছু করার নেই।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে যারা বেরিয়ে আসে তারা যখন নিজেদের সমাজে ফিরে যায় তখন তাদের অবস্থা হয় গায়ে দেয়ার অযোগ্য জামা কিংবা পেটে দেয়ার অযোগ্য খাদ্যের মত। ঐ সমাজের জন্য তারা যে উপযোগী হয়নি, সে কথা সমাজ যেমন বুঝে তেমনি তারা নিজেরাও বুঝে। ফলে সমাজ তাদেরকে নিজের কাজে লাগাতে না পেরে অগত্যা নিলামে চড়িয়ে দেয়। সদ্য পাশ করা ছাত্ররাও ভাবে, কোথাও যখন কাজ জুটছেনা তখন যেখানে হোক এবং যে দামেই হোক, বিক্রি হয়ে যাই। যে জাতি নিজের উৎকৃষ্টতম মানব সম্পদকে জুতো, কাপড় ও খাদ্যের বিনিময়ে বেচে দেয় সে জাতি যে কত বড় হতভাগা তা বাস্তবিকই ভেবে দেখার বিষয়।

আল্লাহ্ তায়ালা যে জনশক্তি ও মেধাশক্তি আমাদের নিজেদের কাজের জন্যই দিয়েছেন তা এখন অন্যদের কাজে লাগছে। আমাদের যুবকদের অমিততেজা দৈহিক শক্তি, তাদের মস্তিষ্কের রকমারি প্রতিভা ও বুকের এবং বক্ষপিঞ্জরের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত আছে তা আমাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহ্ দিয়েছেন। কিন্তু বড়জোর তা শতকরা এক কি দুই ভাগ আমাদের কাজে লাগে। অবশিষ্ট সকটুকুই অন্যেরা কিনে নিয়ে যায়। আরো মজার ব্যাপার হলো মুনাফাবিহীন বিকি কিনিকেই আমরা বিরাট সাফল্য মনে করছি। এ কথা কেউ-ই উপলব্ধি করে না যে প্রকৃত পুঁজিই হলো জনশক্তি। সুতরাং তা বিক্রি করা লাভজনক নয় বরং ষোল আনাই ক্ষতিকর।

উচ্চ শিক্ষালাভ করেছে কিংবা সদ্য পাশ করে বেরিয়েছে প্রায়ই আমার এমন যুবকদের সাথে মেলামেশার সুযোগ হয়। তাদের নিকট আমি সবার আগে এটা জানতে চেষ্টা করি, তারা নিজেদের জীবনের কোন লক্ষ্য স্থির করেছে কিনা কিন্তু যখন দেখি যে, জীবনের কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্থির করেছে এমন যুবকের সংখ্যা হাজারে একজন পাওয়া দুষ্কর, এমন কি মানুষের জীবনের কোন লক্ষ্য আদৌ থাকা উচিত বা থাকতে পারে কিনা, সে বিষয়ে তাদের অধিকাংশেরই ধারণা পর্যন্ত নেই তখন আমার হতাশার শেষ থাকে না। জীবন লক্ষ্যের প্রশ্নকে তারা নিতান্তই দার্শনিক বা কবিসুলভ হেঁয়ালী মনে করে। পার্থিব জীবনে আমাদের কাজ কর্ম ও

চেষ্টা সাধনার একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকা চাই কিনা সে ব্যাপারে কার্যতঃ কোন কিছু স্থির করে নেয়ার প্রয়োজনই তারা অনুভব করে না। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত যুবকদের এই দশা দেখে আমার মাথা ঘুরে যায়। আমি দিশেহারা হয়ে ভাবি, যে শিক্ষা ব্যবস্থায় পনেরো বিশ বছরের একটানা মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের পরও মানুষ নিজের শক্তি ও যোগ্যতাকে কোথায় ব্যয় করবে এবং তার চেষ্টা সাধনার উদ্দেশ্য কি হবে, তা ঠিক করার যোগ্যতাও অর্জন করেনা, এমনকি জীবনের কোন লক্ষ্য আদৌ থাকার দরকার কিনা তাও উপলব্ধি করতে পারে না, সে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কি নামে অভিহিত করা যায়। এটা মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ দানকারী না মনুষ্যত্বকে ধ্বংসকারী শিক্ষা? উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন তো জন্তু জানোয়ারদের কাজ। মানুষও যদি শুধু বাঁচার জন্যই বাঁচতে শেখে এবং নিজের শক্তি সামর্থ ব্যয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রাণ রক্ষা ও সন্তান প্রজনন করাই বুঝে, তা হলে মানুষ ও অপরাপর জীব জন্তুর মধ্যে পার্থক্য থাকে কোথায়?

আমার এ সমালোচনার উদ্দেশ্য আপনাদেরকে ভর্ৎসনা করা নয়। ভর্ৎসনা করা হয় অপরাধীকে। অথচ আপনারা অপরাধী নন। আপনারা মজলুম। তাই আমি আসলে আপনাদের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব নিয়েই এতসব কথা বলছি। আমি চাই কর্ম জীবনে পদার্পণ করতে যাওয়ার প্রাক্কালে নিজেদের অবস্থাটা একবার পর্যালোচনা করে দেখুন যে, এই পর্যায়ে আপনাদের করণীয় কি? আপনারা মুসলিম উম্মতের অংশ। এ উম্মত কোন বর্ণ বা বংশগত জাতীয়তাভিত্তিক নয়। যে ব্যক্তি এর ভেতরে জন্ম নেবে সে আপনা আপনি মুসলমান বলে গণ্য হবে এমনও নয়। এটা কোন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীও নয় যে, এর সাথে কেবল সামাজিকভাবে সম্পৃক্ত হওয়াই মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। প্রকৃত পক্ষে ইসলাম হলো একটা আদর্শ। মানুষের সামাজিক জীবন তার সকল দিক ও বিভাগ এই আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠে। এ জাতির অন্তর্ভুক্ত যারা, তারা এই আদর্শকে বুঝবে, এর মর্ম ও তাৎপর্য উপলব্ধি করবে এবং নিজেদের সামষ্টিক জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে এই তাৎপর্যের বাস্তব ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ পদ্ধতির রূপায়ণ ঘটাবে। তবেই তাদের মুসলিম জাতীয়তা রক্ষা পাবে, নচেৎ নয়। বিশেষতঃ মুসলিম জাতির মধ্যে যারা শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবি তাদের জন্যেই সবচেয়ে বেশী দরকার এই জ্ঞান-বুদ্ধি ও চরিত্রের। কেননা তারাই জাতির নেতা। আপন জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ছাপ শিক্ষিত সমাজের জীবনে পুরোপুরি থাকা প্রত্যেক জাতির জন্যই প্রয়োজন। কিন্তু মুসলিম জাতির জন্য এর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। কেননা ভৌগলিক, বংশগত কিংবা ভাষাগত ভিত্তিতে এ জাতির সদস্য হওয়ার উপায় নেই। মুসলিম জাতির সদস্য হতে হলে চাই কেবল পরিপূর্ণ ও পরিপক্ক ইসলাম তথা ইসলামী আকীদা-

বিশ্বাস, ইসলামী আমল ও ইসলামী চরিত্র। আমাদের জাতির সদস্যগণ বিশেষত শিক্ষিত শ্রেণীর-ইসলামী চিন্তা-বিশ্বাস ও ইসলামী আমল-আখলাকের অধিকারী হওয়া ছাড়া সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ও উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। এ কারণে তাদের শিক্ষায় ও অনুশীলনে যতটা ও যে ধরনের ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকবে, আমাদের জাতীয় জীবনে তার তেমনি প্রভাব পড়া অনিবার্য। আর যদি তাদের মধ্যে ইসলামী ধ্যান-জ্ঞান ও আমল-আখলাক একেবারেই না থাকে তবে সেটা হবে আমাদের ধ্বংস ও মৃত্যুর পূর্বাভাস।

এটা এমন একটা বাস্তবতা যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলিম জাতির নতুন বংশধরদের শিক্ষা দীক্ষার যে ব্যবস্থা করা হয়, তা মূলত তাদেরকে জাতির নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নয়, জাতিকে ধ্বংস করার জন্যই তৈরী করা হয়। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রদেরকে পড়ানো হয় দর্শন, অর্থনীতি, আইন শাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং এ ধরনের অন্যসব বিদ্যা যার চাহিদা বাজারে আছে। কিন্তু ইসলামী দর্শন, ইসলামী বিজ্ঞানের মৌলিকত্ব, ইসলামী আইন বিজ্ঞান, ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ এবং ইসলামের ইতিহাস ও ইতিহাস দর্শনের বিন্দু বিসর্গও তারা জানতে পারে না। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, তাদের মন-মগজে মানব জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অ-ইসলামী ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। আর অ-ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনের প্রতিটি বিষয়কে দেখে ও ভাবে তথা দেখতে ও ভাবতে বাধ্য হয়। কেননা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কখনও তাদের সামনে তুলে ধরা-ই হয় না। বিক্ষিপ্ত ও বিচিছন্নভাবে ইসলামের কিছু কিছু তত্ত্ব ও তথ্য জানতে পারলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয় নিতান্তই ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তা হয় কুসংস্কার এবং কাল্পনিক ও উদ্ভট ধ্যান-ধারণার আধার। এসব তত্ত্ব ও তথ্য জানার ফলে তাদের মন-মগজ ইসলাম থেকে আরো দূরে সরে যায়। যারা নিছক বাপ-দাদার ধর্ম হবার কারণে ইসলামের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি রাখে, তারা মন-মগজের দিক দিয়ে অমুসলিম হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে থাকে যে, আমি বুঝতে না পারলেও ইসলাম নিশ্চয়ই একটা সত্য ধর্ম। আর যারা এই ভক্তি-শ্রদ্ধাটুকুও হারিয়ে বসেছে, তারা ইসলামের ওপর নানা রকমের আপত্তি তুলতে এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতেও দ্বিধা করে না।

এ ধরনের শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব অনুশীলনের যে সুযোগ পাওয়া যায় তা একই রকম। যে পরিবেশে তারা থাকে এবং বাস্তব জীবনের যেসব নমুনার সাক্ষাত তারা লাভ করে, তাতে কোথাও কোন ইসলামী চরিত্র ও ইসলামী আচার-আচরণের নাম নিশানাও পাওয়া যায় না। এভাবে যারা বিদ্যাগতভাবেও ইসলামের

জ্ঞান পেলো না, বাস্তব অনুশীলনেও সাক্ষাত পরিচয় পেলো না, তারা তো আর ফেরেশতা নয় যে আপনা আপনি মুসলমান হয়ে গড়ে উঠবে। তাদের উপর তো আর অহী নাযিল হয় না যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মনে ইসলামের জ্ঞান সৃষ্টি হবে। তারা পানি আর বাতাস থেকে তো ইসলামের জ্ঞান পেতে পারে না। কাজেই চিন্তা ও কর্মে তাদের মধ্যে যদি অ-ইসলামী ভাবধারা দেখা যায় তবে সেটা তাদের দোষ নয়। বরং তা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাঙ্গনের দোষ। তাই আমি আবারো বলতে চাই নিজের দিব্য জ্ঞান থেকে আমি উপলব্ধি করি যে, এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যত আপনাদের জবাই-ই করা হয়। এবং সমগ্র মুসলিম জাতির কবর রচনা করা হয়। যে সমাজে আপনারা জন্মগ্রহণ করেছেন, যে সমাজ আপনাদের লেখা-পড়ার খরচ যুগিয়েছে, যার ভাল মন্দের সাথে আপনার ভাল মন্দ এবং যার জীবনের সাথে আপনার জীবন এক সুতায় গাঁথা, সেই সমাজের জন্য আপনাদেরকে সম্পূর্ণ অকর্মণ্য করে দেয়া হয়েছে। এ সমাজের কল্যাণের জন্য কোন কাজ করার যোগ্য করে আপনাদেরকে তৈরী করা হয় নি। শুধু তাই নয়, বরং আপনাদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে এমন করে গড়া হয়েছে যে, আপনাদের ইচছা না থাকলেও আপনাদের প্রতিটি কাজ মুসলিম জাতির জন্য বিপজ্জনক হবে। এমনকি যদি আপনারা এ জাতির কল্যাণের জন্যও কিছু করতে চান তবে তাও হবে তার জন্য ক্ষতিকর। কেননা আপনাদেরকে মুসলিম উম্মাতের স্বভাব ধর্ম তথা ইসলাম ও তার প্রাথমিক মূলনীতিগুলো থেকে পর্যন্ত অজ্ঞ রাখা হয়েছে। আপনাদের সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন সম্পন্ন হয়েছে মুসলিম জাতির জাতীয় রূপরেখার সম্পূর্ণ বিপরীত বিন্দু থেকে।

নিজেদের এই অবস্থাটা যদি আপনারা বুঝতে পেরে থাকেন এবং কি বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়া হচেছ তা যদি উপলব্ধি করতে পেরে থাকেন, তাহলে আপনারা কিছু না কিছু ক্ষতিপূরণের চেষ্টা যে করবেনই, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। পুরোপুরি ক্ষতিপূরণ করা অত্যন্ত দুষ্কর। তবে আমি আপনাদেরকে তিনটে কাজ করার পরামর্শ দেবো। এ তিনটে কাজ করলে আপনাদের যথেষ্ট উপকার হবে।

প্রথমতঃ আপনারা যতটা সম্ভব আরবী ভাষা শিখতে চেষ্টা করুন। ইসলামের আসল উৎস কুরআনের ভাষা আরবী। কুরআনকে যতক্ষণ তার নিজের ভাষায় না পড়বেন, ততক্ষণ ইসলামের মূল চিন্তাধারা বুঝতে পারবেন না। আরবী ভাষার

প্রাচীন জটিল পদ্ধতি এখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। নতুন পদ্ধতিতে মাত্র ছ'মাসেই কুরআন বুঝার মত আরবী শেখা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কুরআন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন কথা এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবন চরিত্র অধ্যয়ন করা ইসলামকে বুঝবার জন্য অপরিহার্য। জীবনের বার চৌদ্দটি বছর যখন রকমারি বিষয় পড়ে নষ্ট করে দিয়েছেন, তখন যে জিনিসের উপর জাতির অস্তিত্ব নির্ভরশীল এবং যে জিনিস না জানলে আপনারা এ জাতির কোন কাজেই লাগতে পারবেন না, সে জিনিসের জন্য অন্তত অর্ধেক বা সিকিভাগ সময় ব্যয় করুন।

তৃতীয়তঃ অসম্পূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে ইসলাম সম্পর্কে ভালোমন্দ যে মতামতই পোষণ করে থাকেন না কেন, তা মন-মগজ থেকে ঝেড়ে ফেলুন। এরপর ইসলাম সম্পর্কে ধারাবাহিক ও নিয়মিতভাবে (ঝুংঃবসধঃরপ ঝঃঁফু) পড়াশুনা করুন। পড়াশুনার পর আপনি যে মতামতই অবলম্বন করেন তার গুরুত্ব থাকবে। শিক্ষিত লোকদের পক্ষে কোন জিনিস সম্পর্কে ভালো করে না জেনেই একটা মত পোষণ করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়। আল্লাহ আপনাদেরকে সাহায্য করুন, এই দোয়া করেই আমার ভাষণ শেষ করছি।

নয়া শিক্ষাব্যবস্থা

[১৯৪১ সালের ৫ জানুয়ারী দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামা লাখনৌর ছাত্র সমিতির অধিবেশনে এ ভাষণ দেয়া হয়]

ভদ্র মহোদয়গণ!

আজ আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি যে এ যুগে যে জায়গায় সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার চিন্তা দানা বেঁধেছে, সেখানে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পেলাম। শুধু চিন্তা দানা বাঁধেনি, সর্বপ্রথম পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে এখানেই। এ জন্য আমি শিক্ষা সংস্কার ও সংশোধনের বিষয়টাকেই আমার আলোচ্য বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি। এটাকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে বেছে নেয়ার একটা বড় কারণ এই যে, আজকাল আমাদের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংস্কারের ব্যাপারে কথাবার্তা বেশ জোরেশোরেই চলছে। এ থেকে বুঝা যায়, সংস্কারের প্রয়োজন যে আছে, তা বেশ অনুভব করা হচেছ। তবে কথা বার্তার হাবভাব থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচেছ যে, সংস্কার যারা চান তারা সমস্যাটা যে কি ধরনের সে সম্পর্কে তেমন পরিষ্কার ধারণা রাখেন না। তারা মনে করেন, পুরনো শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি শুধু এই যে, ওটা বড্ড সেকেলে এবং তাতে কোন কোন বিষয় অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় কম কিংবা বেশী। আধুনিক যুগের কোন কোন জরুরী বিষয় এর অন্তর্ভূক্ত না থাকলেও তারা এটাকে একটা ত্রুটি মনে করেন। এরূপ মনে করার কারণে তারা সংস্কার ও সংশোধনের আলোচনাকে খুবই সীমিত গন্ডিতে আবদ্ধ করেন। তাঁদের মতে কতকগুলো কিতাব পাঠ্যসূচী থেকে বাদ দিয়ে নতুন কতকগুলো কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া উচিত। পাঠ্য বিষয়গুলোর মধ্যে কোনটার আনুপাতিক পরিমান কমানো এবং কোনটার বাড়ানো উচিত। আর পুরনো বিষয়গুলোর সাথে সাথে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু বই পুস্তক পড়ানো দরকার। শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং বিদ্যালয়সমুহের প্রশাসনিক ব্যাপারেও এই ধরনের কিছু আংশিক সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়ে থাকে। যারা একটু বেশী মাত্রায় আধুনিকমনা তাঁরা উপদেশ দেন যে, প্রত্যেক মৌলবীকে ম্যাট্রিক স্তরের ইংরেজী পড়িয়ে দাও যাতে কমপক্ষে টেলিগ্রাম লেখা ও পড়ার যোগ্যতা লাভ করতে পারে। কিন্তু এই যে আধুনিকতা আজ দেখানো হচেছ তাও বাসি হয়ে গিয়েছে। এ মনোভাব আপনাদের দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামারই সমসাময়িক। কিছু সংখ্যক মৌলবী আগের

চেয়ে একটু যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে বেরুবে, এর চেয়ে বেশী কিছু উপকার এতে হবে না। তারা জার্মানী ও আমেরিকা সম্পর্কে কিছু কিছু কথা বলতে শিখবে। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে বর্তমান দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আলেম সমাজের হাতে এসে যাবে এরূপ কখনও হতে পারে না। যে পৃথিবী অগ্নিকুন্ডের দিকে পরিচালনাকারী নেতৃবৃন্দের (Leaders) পেছনে চলছে তারা যে জান্নাতের দিকে আহ্বানকারী নেতাদের নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হবে, তাও নয়। এরূপ ফল পেতে হলে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবী সংস্কারের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে একটা নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। আজকের আলোচনায় আমি সেই নয়া শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই।

জ্ঞান ও নেতৃত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক

সর্বপ্রথম ভেবে দেখা দরকার যে, দুনিয়ায় নেতৃত্ব (Leadership) ও কর্তৃত্ব কিসের উপর নির্ভরশীল? কখনো মিশর নেতৃত্বে আসীন হয় এবং সারা দুনিয়া তার পেছনে চলতে আরম্ভ করে। কখনো ব্যাবিলনের হাতে চলে যায় কর্তৃত্বের চাবি-কাঠি এবং সমগ্র দুনিয়া তার অনুসরণ করে। কখনো গ্রীস নেতৃত্ব লাভ করে আর সারা দুনিয়া করে তার পদানুসরণ। কখনো ইসলাম গ্রহণকারী জাতিগুলোর হাতে যায় নেতৃত্বের বাগডোর এবং সারা পৃথিবী তার বশ্যতা স্বীকার করে। আবার কখনো ইউরোপ পায় কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের লাগাম আর সারা দুনিয়ার মানুষ করে তার আনুগত্য। এ সব কেন হয়? কি কারণে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আজ একজন পায়, আবার কাল তার হাতছাড়া হয়ে অন্যের হাতে চলে যায় ? আবার তার পরের দিন তার হাত থেকেও তা তৃতীয় জনের অধিকারে চলে যায় ? এ সব কি অনিয়মিত আকস্মিক ঘটনা মাত্র ? না এর কোন সুনির্দিষ্ট নীতি আছে? এ বিষয় নিয়ে যত বেশী চিন্তা করা যায় ততই কেবল এ উত্তর পাওয়া যায় যে, এর একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে এবং সেই নিয়মটা হলো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সব সময় জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। প্রাণী জগতে একমাত্র মানুষ জ্ঞানের কারণেই এ পৃথিবীর খলীফা হয়েছিল। তাকে চোখ, কান ও মন-মস্তিষ্ক দেয়া হয়েছে। অন্যান্য প্রাণীকে এগুলো হয় আদৌ দেয়া হয় নি, নয়তো অপেক্ষাকৃত কম দেয়া হয়েছে। এ জন্য অন্য সমস্ত সৃষ্টির ওপর মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধি করে দেয়া হয়েছে। এখন খোদ

মানব জাতির মধ্যে যে শ্রেণী বা গোষ্ঠী জ্ঞান বা শিক্ষার গুণে অন্যদেরকে ছাড়িয়ে যাবে, তারাই সমগ্র মানব জাতির নেতা হতে পারবে। ঠিক যেমন সৃষ্টি জগতের মধ্যে মানুষ অন্য সব সৃষ্টির ওপর এই জ্ঞানের বদৌলতেই খলীফা হতে পেরেছিল।

নেতৃত্ব বন্টনের নিয়ম বা বিধি

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এই জ্ঞান বস্তুটা কি এবং এতে এগিয়ে বা পিছিয়ে থাকার অর্থ কি? এর জবাব হলো পবিত্র কুরআনে 'সাম'আ শ্রবণ-শক্তি, 'বাছার' দৃষ্টি শক্তি ও 'ফুয়াদ' মন বা উপলব্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঐ তিনটি শব্দেই এ প্রশ্নের জবাব রয়েছে। কুরআনে ঐ তিনটি শব্দ শুধু দেখা, শোনা ও চিন্তা করার অর্থে ব্যবহৃত হয় নি।

'সাম'আ' বা শ্রবণ-শক্তি বলে বুঝানো হয়েছে অন্যের দেয়া তথ্য সংগ্রহ করা, 'বাছার' বা দৃষ্টি শক্তির অর্থ নিজে পর্যবেক্ষণ করে তথ্য উদ্ধর করা এবং 'ফুয়াদ' বা চিন্তাশক্তির অর্থ ঐ দুই মাধ্যম দ্বারা অর্জিত তথ্য সমূহের সমন্বয় সাধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এই তিনটি জিনিসের সমাবেশেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে যা কেবল মানুষকেই দেয়া হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে প্রত্যেক মানুষই এই তিনটি শক্তি ব্যবহার করছে। এ কারণে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টির ওপর প্রত্যেক মানুষেরই প্রতিনিধিত্বমূলক আধিপত্য বজায় রয়েছে। একটু বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখলে জানা যাবে যে, ব্যক্তিগতভাবে যেসব মানুষ এই তিনটি শক্তিকে অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহার করে, তারা পরাজিত ও পর্যুদস্ত থাকে। তারা অন্যের অধীন ও অনুগত থাকতে বাধ্য হয়। অন্যের পেছনে পেছনে চলাই তাদের কাজ। পক্ষান্তরে যারা এই তিনটি শক্তিকে সর্বাধিক ব্যবহার করে, তারা হয় শ্রেষ্ঠ ও পরাক্রান্ত। নেতৃত্বের বাগডোর তাদের হাতেই এসে যায়। তবে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করা ও হারানোর প্রাকৃতিক বিধান জানবার জন্য বিষয়টার প্রতি আরো সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিতে হবে। তা হলে দেখা যাবে, একটা গোষ্ঠী মানব জাতির নেতা হয় তখনই, যখন তারা একদিকে অতীত ও বর্তমান কালের মানুষের কাছ থেকে যত বেশী তথ্য যোগাড় করে অপরদিকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আরো বেশী তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত থাকে, অতঃপর এই দুই রকম তথ্য সংগ্রহ করার পর তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করে। তাদের পর্যবেক্ষণের নিরিখে আগের যে সব জিনিস ভুল বলে প্রমাণিত হয় তারা তার সংশোধন করে। যেগুলোর অসম্পূর্ণতা নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার আলোকে ধরা পড়ে, তাকে পূর্ণতা

দান করে। আর যে সব নতুন তথ্য জানতে পারে, তা যথা সম্ভব বেশী করে কাজে লাগায়। এই গুণাবলী যতক্ষণ ঐ গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যান্য মানব গোষ্ঠীর চেয়ে বেশী থাকে, ততক্ষণ সেই গোষ্ঠী সমগ্র মানব জাতির নেতৃত্ব দিতে থাকে। আর যে গোষ্ঠীর মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ অপেক্ষাকৃত কম হয় তাদের জন্য আল্লাহর অকাট্য ফায়সালা হলো; তারা অন্যদের আনুগত্য করবে, অনুকরণও করবে। যদি সৌভাগ্যবশত অধীনতা থেকে বেঁচে যায়, তাহলেও অনুকরণ থেকে তাদের রেহাই নেই। চাই সেটা জেনে বুঝে স্বেচছায় করুক কিংবা না জেনে না বুঝে বাধ্য হয়ে করুক ।

নেতৃত্বের পদে আসীন গোষ্ঠীটির উত্থানযুগ খতম হয়ে গিয়ে যখন পতনের যুগ ঘনিয়ে আসে তখন তারা ক্লান্ত হয়ে নিজেদের অতীতে অর্জিত জ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করতে থাকে। নিজেদের পর্যবেক্ষণ দ্বারা আরো বেশী জ্ঞান অর্জন করা এবং মন-মগজকে ব্যবহার করে আরো বেশী সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা ত্যাগ করে। তাদের সমস্ত জ্ঞানগত পুঁজি কেবল কান দিয়ে শোনা তথ্যাবলীর মধ্যেই সীমিত হয়ে যায়।

এ অবস্থায় জ্ঞান বলতে তারা শুধু অতীতের জানা তথ্যভান্ডারকেই বোঝে। অতীতে অর্জিত জ্ঞানই যথেষ্ট, তাতে কোন কিছু যোগ করার দরকার নেই এবং অতীতের গৃহীত মতামত সমূহই সম্পূর্ণ, তাতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের প্রয়োজন নেই এই ভুল ধারণায় তারা ডুবে থাকে। এ পর্যায়ে উপনীত হয়েই এই গোষ্ঠী আপনা আপনি নেতৃত্বের আসন থেকে সরে যায়, আর সরতে না চাইলে জোর করে হটিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর দ্বিতীয় যে গোষ্ঠীটি অধিকতর তথ্য সংগ্রহ, অধিকতর মতামত গ্রহণ এবং অধিকতর গঠনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসে, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তাদেরই অধিকারে আসে। তখন যারা আগে নেতা ছিল তারা নতুন নেতার অধিকারী হয়, আগে যারা স্বচছ জ্ঞানের অধিকারী এবং দুনিয়ার উস্তাদ ছিল তাদেরকে প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং সেখানে বসে তারা প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা প্রদান করতে থাকে।

প্রচলিত ইসলমী শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক ত্রুটি ঃ

বস্তুত নেতৃত্ব দোযখগামী কিংবা বেহেশ্‌তগামী যা-ই হোক না কেন; যারা চোখ, কান ও মন-মগজের সদ্ব্যবহার অন্য সমস্ত মানব গোষ্ঠীর চাইতে বেশী করবে একমাত্র তাদের অধিকারে তা আসবে, এটা মানুষের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত অকাট্য ও শাশ্বত নীতি। এ নীতিতে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। যে কোন মানব

গোষ্ঠী এই শর্ত পূরণ করলে তারা দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করবেই, চাই সে আল্লাহর ফরমাবরদার হোক বা না-ফরমান হোক। আর এ শর্ত পূরণ না করলে তাকে হতে হবে অনুগামী। এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাধীন হওয়াও অবধারিত।

যে জিনিসটি আপনাদেরকে নেতৃত্বের আসন থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং খোদাদ্রোহী পাশ্চাত্যবাদীদের সে আসনে বসিয়েছে তা এই অসহনীয় বিধান ছাড়া আর কিছুই নয়। দীর্ঘদিন ব্যাপী আমাদের জ্ঞানের রাজ্যে বিরাজ করছিল শোচনীয় দুরবস্থা। আমাদের চোখ ও মন-মগজ ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। কান যেটুকু সক্রিয় ছিল তাও পুরনো জ্ঞান অর্জন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ এই সময়ে জ্ঞানের জগতে এগিয়ে গেল খোদাদ্রোহী ইউরোপবাসী। তারা কানকেও কাজে লাগালো আমাদের চেয়ে বেশী। আর চোখ ও মন-মগজের কাজ আড়াইশো তিনশো বছর ধরে তারাই এককভাবে করলো। এর অনিবার্য ফল হিসেবে তারা দুনিয়ার নেতৃত্ব লাভ করলো। আর আমরা হয়ে গেলাম তাদের পদানুসারী। পরিণতি এরূপ হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্রগুলো আজও ঐ সর্বনাশা ভুলকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাচ্ছে। অথচ আজকে আমাদের এই দুর্দশা সেই ভুলেরই পরিণতি। এ সব মাদ্‌রাসায় ইল্‌ম বা বিদ্যা যেটুকু পড়ানো হয় তা শুধু প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। নাদওয়া এবং আল-আজহার সংস্কারের দিকে পা বাড়িয়েছে সত্য কিন্তু সেটা অতীতের সাথে সাথে বর্তমান কালের জ্ঞান আহরণের কাজটাকেও কানের দায়িত্বের আওতাভুক্ত করা পর্যন্তই। চোখ আর মন-মগজ আগের মতই নিষ্ক্রিয় রয়ে গিয়েছে। এই বাড়তি জ্ঞানটুকুর উপকারিতা বড় জোর এতটাই হতে পারে যে মুসলমানেরা আগে যেখানে খুব নিচু মানের অনুসারী ছিল সেখানে একটু উন্নতমানের অনুসারি হয়ে যাবে। কিন্তু নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তাদের নাগালের বাইরেই থেকে যাবে। আজ পর্যন্ত যতগুলো সংস্কারমূলক পদক্ষেপ আমি দেখেছি তার সবই ভালো মানের অনুসারী তৈরী করার প্রস্তাব। নেতৃত্ব সৃষ্টির মত প্রস্তাব আজও আসে নি। অথচ দুনিয়ায় আল্লাহর অনুগত একমাত্র মানব গোষ্ঠী হিসেবে মুসলিম জাতির উপর যে দায়িত্ব বর্তায় তা পালন করতে হলে খোদাদ্রোহীদের কাছ থেকে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসন ছিনিয়ে নেয়া ও তা দখল করা অপরিহার্য। আর সেটা করার একমাত্র উপায় হলো আমাদেরকে পুরনো জ্ঞান-ভান্ডারের ওপর সন্তুষ্টি

পরিত্যাগ করতে হবে। চোখ ও মন-মগজকে সক্রিয় করে তুলতে হবে এবং দুনিয়ার অন্য সকল মানব-গোষ্ঠীর ওপর এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হবে।

কি ধরনের সংস্কার প্রয়োজন?

আমি বলেছি যে, দুনিয়ায় আল্লাহর অনুগত একমাত্র মানব গোষ্ঠী হিসেবে আপনাদের (মুসলিম জাতির) ওপর যে দায়িত্ব বর্তায়, সেটা পালন করতে হলে খোদাদ্রোহী মানব গোষ্ঠীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে দখল করতে হবে। এ কথাটাই আমার সমগ্র আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। তাই আমি এ কথাটা আরো বিশ্লেষণ করবো।

নিছক একটা মানব-গোষ্ঠী হিসেবে যেনতেন প্রকারের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব অর্জনই যদি কাম্য হয় তাহলে শিক্ষা-সংস্কারের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। সোজা পথ খোলা রয়েছে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় অথবা মিসর, ইরান ও তুরস্কের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা-কারিকুলাম অনুসারে শিক্ষার ময়দানে অগ্রগামী হোন এবং ইউরোপ ও আমেরিকা যে ধরনের নেতৃত্বের অধিকারী, যে ধরনের নেতৃত্বের জন্য জাপানও আজকাল প্রতিযোগিতায় নেমেছে, সেই ধরনের নেতৃত্বের জন্য প্রার্থী হয়ে যান। কিন্তু আল্লাহর অনুগত মানবগোষ্ঠী হওয়ার কারণে আপনাদের অবস্থা তা নয়। নেতৃত্ব জান্নাতের পথের দিশারী হোক কিংবা দোযখের পথের দিশারী হোক নেতৃত্বই প্রকৃত লক্ষ্য এরূপ অবস্থা আপনাদের নয়। ইউরোপের সাথে আমাদের বিরোধ শুধু এ জন্য নয় যে, তারা নেতৃত্বের পথ থেকে সরে থাকুক আর আমরা তাদের জায়গা দখল করে নেতা হয়ে বসি। বরং তাদের সাথে আমাদের বিরোধ হলো আদর্শ ও লক্ষ্যের। তারা দুনিয়ার ওপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চালাচেছ খোদাদ্রোহীতা ও না-ফরমানীর ভিত্তিতে, আর দুনিয়াবাসীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জাহান্নামের দিকে। পক্ষান্তরে মুসলিমরা হচ্ছে আল্লাহর ফরমাবরদার মানব-গোষ্ঠী। আল্লাহর আনুগত্যই তাদের নীতির ভিত্তি। ঈমানের অনিবার্য দাবী হিসেবে তাদের উপর এটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় যে, নিজেরাও যেমন জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং বেহেশ্তের পথে চলবে তেমনি সমগ্র দুনিয়াবাসীকেও সেই পথে চালাবে। পাশ্চাত্যবাসীর হাত থেকে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চাবিকাঠি ছিনিয়ে নিয়ে মুসলিম জাতির নেতৃত্ব নিজে দখল করা ছাড়া তার পক্ষে ঐ কর্তব্য পালন করা অসম্ভব। সে জন্যই পাশ্চাত্যবাসীর সাথে আমাদের বিরোধ। এ বিরোধ বর্ণ, বংশ অথবা ভৌগলিক কারণে নয়, সম্পূর্ণরূপে আদর্শিক কারণে। খোদাদ্রোহী নেতৃত্ব-

চাই তা তুর্কী, ইরানী, মিশরী অথবা ভারতীয় যে জাতেরই হোক না কেন-বৃটিশ কিংবা জাপানি জাতের নেতৃত্বের মতই তাকে উৎখাত করা কর্তব্য। অনুরূপভাবে খোদামুখী নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা অবশ্য কর্তব্য-চাই তার নিশানবাহী ভারতীয় কিংবা বৃটিশ অথবা অন্য কোন জনগোষ্ঠীর লোক হোক।

খোদাবিমুখ নেতৃত্বের পরিণাম ঃ

কোন নেতৃত্ব বেহেশ্‌তগামী না দোযখগামী তা নির্ভর করে ঐ নেতৃত্বের খোদামুখিতা অথবা খোদা বিমুখতার উপর। একটা খোদাবিমুখ মানব গোষ্ঠী যখন নিজেদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে ও জ্ঞানগত তৎপরতা ও উৎকর্ষের বদৌলতে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভ করে, তখন সে বিশ্ব-জগতকে খোদাহীন ঠাওরে নিয়ে সেই দৃষ্টিভঙ্গীতেই কান ও চোখের দ্বারা অর্জিত সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ও সমন্বয় ঘটায়। তারা মনে করে, মানুষের কোন দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য নেই। দুনিয়ার যেসব জিনিস তাদের নিয়ন্ত্রাধীন, সে সবের সে নিজেই মালিক। সব কিছুর উপর তার সার্বভৌম ক্ষমতা। সেগুলোকে কিভাবে কাজে লাগাবে এবং কি উদ্দেশ্যে লাগাবে, সেটা স্থির করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তার। তার সমস্ত চেষ্টা-সাধনা ও তৎপরতার চূড়ান্ত লক্ষ্য তার প্রবৃত্তির খায়েশ চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছু নয়। জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানের সমন্বয় সাধন যখন এই দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়, তখন তার ফল দাঁড়ায় এই যে, খোদাবিরোধী পথ ও প্রক্রিয়ায় তত্ত্ব-জ্ঞান ও পদ্ধতিগত কলাকৌশল উভয়েরই বিকাশ বৃদ্ধি ঘটে। সেই প্রক্রিয়া সারা দুনিয়ার মানুষের মন-মগজকেও আচছন্ন করে ফেলে। আর এ থেকেই জন্ম নেয় নিরেট জড়বাদী ও ভোগবাদী চরিত্র। এ থেকেই উদ্ভূত হয় মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের সমস্ত নীতি ও বিধি। মানুষ তার যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতা কোথায় কিভাবে প্রয়োগ করবে তাও নির্ণয় করে ঐ দৃষ্টিকোণ থেকেই। এক কথায়, সমগ্র মানব জীবনের প্রবাহ ঐ পথেই এগিয়ে চলে এবং তার শেষ স্তরে পৌঁছে এই দুনিয়া থেকেই জাহান্নামের আযাব শুরু হয়ে যায়। সে আযাবের নমুনা আপনারা আজ স্ব-চক্ষেই দেখতে পাচেছন।*

এই খোদাবিমুখ জ্ঞান-বুদ্ধি ও কলা কৌশল যতদিন দুনিয়ার চিন্তাধারা, নৈতিকতা এবং সভ্যতা ও কৃষ্টির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে ততদিন খোদার অনুগত দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূত নৈতিকতা ও সভ্যতার জন্য আকাশ ও পৃথিবীর কোথাও কোন স্থান থাকে না। মানুষের চিন্তা-ভাবনা করার

নিয়ম পদ্ধতি তার বিরোধী হয়ে যায়। মানুষের মেজাজ, স্বভাব প্রকৃতি ও রুচি তার বিরুদ্ধে চলে। মানুষের অর্জিত জ্ঞানের বিকৃতি বিন্যাস তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। সমস্ত চারিত্রিক নীতিমালা এবং মূল্যমান নিরূপনের যাবতীয় মাপকাঠি তার পরিপন্থী হয়ে যায়। জীবন যাপনের রীতি-নীতিতে এবং মানবীয় চেষ্টা ও কর্মের সকল ময়দানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় খোদানুগত্যের নীতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটা জিনিস অগ্রাহ্য ও অবাঞ্ছিত সাব্যস্ত হয়। এমনকি যারা খোদানুগত্যের পথে চলার দাবী করে তারাও কার্যত সে পথে চলতে সক্ষম হয় না। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের স্রোত প্রবাহ তাদেরকে জবরদস্তি করে নিজ গতিপথে টেনে নিয়ে যায়। এর বিরুদ্ধে তারা যত ধবস্তা-ধবস্তিই করুক কার্যকর কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয় না। তারা বড় জোড় এতটুকু সংগ্রাম করতে পারে যে, মাথা নিচের দিকে তলিয়ে যেতে না দিয়ে কোন রকমে তা উপরমুখী রেখে ভেসে যেতে থাকবে।

চিন্তার জগতে যারা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্য বিস্তার করে এবং জাগতিক শক্তিগুলোকে বিজ্ঞানের শক্তি বলে করায়ত্ব করে কাজে লাগায়, তাদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য শুধু চিন্তার জগতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, জীবনের গোটা পরিমন্ডলেই বিস্তৃত হয়। ভূ-খন্ডের উপর তার প্রগতি জন্মে। জীবন জীবিকার চাবিকাঠি তাদের অধিকারে আসে। সার্বভৌম শাসন ক্ষমতা তাদের হস্ত গত হয়। এ জন্য সমাজ জীবনের সমস্ত কায়কারবার ও রীতিপ্রথা ঐ পরাক্রান্ত গোষ্ঠীটির দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব অনুসারে এবং তাদের মনোনীত নীল-নক্শা ও নিয়ম-কানুন অনুযায়ী চলতে থাকে। এমতাবস্থায় দুনিয়ার জীবন ও তার যাবতীয় কায়কারবারে আধিপত্যশীল ঐ গোষ্ঠীটি যদি খোদার অবাধ্য হয় তাহলে তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধীনে খোদার প্রতি আনুগত্যশীল কোন গোষ্ঠী সংগতি রক্ষা করে জীবন-যাপন করতে পারে না। গাড়ীর ড্রাইভার যদি গাড়ী কলকাতার দিকে নিয়ে যেতে থাকে তবে যাত্রী সেই গাড়ীতে করে ঢাকায় যাবে কেমন করে? ইচছায় হোক অনিচছায় হোক তাকে গাড়ী যেখানে যাচেছ সেখানেই যেতে হবে। যাত্রী যদি খুব বেশী বিগড়ে যায় তবে বড় জোর নিজের মুখখানা ঢাকার দিকে ফিরিয়ে বসতে পারে। কিন্তু লাভ হবে না কিছুই? একান্ত অনিচছা সত্ত্বেও গন্তব্য স্থানের বিপরীত ঠিকানাতে পৌঁছে যাওয়া ছাড়া তার উপায় নেই।

* এই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চলছিল—অনুবাদক

বর্তমান পরিস্থিতি ঃ

প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে এই পরিস্থিতিই বিদ্যমান। মুসলিম জাতির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব হারানোর পর ইউরোপ শিক্ষার ময়দানে অগ্রগামী হলো। অনিবার্য কিছু কারণে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে উঠলো খোদাদ্রোহী (Theophobia)। এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই তারা সংগ্রহ করলো শ্রুতিলব্ধ জ্ঞান পুঁজি। ঐ দৃষ্টিভঙ্গীতেই প্রাকৃতিক জগতকে পর্যবেক্ষণ করে নবতর জ্ঞান অর্জন করলো। আর এই উভয় জ্ঞানের সমন্বয় ও বিন্যাস ঘটিয়ে তার নির্যাস গ্রহণ করলো একই দৃষ্টিভঙ্গীতে। মানব-জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নৈতিক নীতিমালা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নিয়ম-বিধি ও রীতি-প্রথা এবং ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনের আচার-আচরণের পদ্ধতিও ঐ দৃষ্টিভঙ্গীতেই রচনা করলো। স্বাধীন গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে অর্জিত বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রয়োগ ক্ষেত্রও নির্ণয় করলো তারা ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে। অবশেষে এই জ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে যখন তারা আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হলো তখন একদিকে দেশের পর দেশ এবং জাতির পর জাতি তাদের সামনে নতজানু হতে লাগল। অপর দিকে সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, সেই মানসিকতা, সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, সেই চিন্তাধারা, সেই নৈতিক আচরণ-পদ্ধতি, সেই সামাজিক ও তামাদ্দুনিক রীতি-নীতি এক কথায় এই বিজয়ী জাতির কাছে যা কিছু ছিল সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লো। ক্রমে অবস্থা এতদূর গড়ালো যে, যে সময় একটি শিশুর বোধ-শক্তির উন্মেষ ঘটে ঠিক সে সময় থেকেই তার মন-মগজ ও স্বভাব-চরিত্রকে ইউরোপবাসীর মনোনীত ও পরিকল্পিত নীল-নক্শা অনুসারে গঠন করা শুরু হয়ে যায়। কেননা তারা বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। পারিপার্শ্বিকতা থেকে লব্ধজ্ঞান তাদেরই ধারাক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হয় শিশুর মন-মগজে। পর্যবেক্ষণের জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন, তাও সে পায় সমন্বয় লব্ধ ঐ ইউরোপবাসীর কাছ থেকেই। আর মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে ট্রেনিং ও অনুশীলনের প্রয়োজন তাও তাদেরই পন্থায় অর্জিত হয়ে থাকে। হক ও বাতিল, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ এবং গ্রহণীয় ও বর্জনীয় নিরূপনের জন্য সে তাদেরই মানদন্ডকে সহজলভ্য মনে করে। নৈতিক, আদর্শ জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং চেষ্টা সাধনা ও কাজ কর্মের যে পথ ও পন্থা তার সামনে উদ্ভাসিত হয় তাও তাদের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। তার আশপাশের গোটা কারখানাকে সেই পরাক্রান্ত ইউরোপের

রীতিনীতি অনুসারেই চলতে দেখে। আর এই মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠার পর যখন সে কর্মজীবনে পদার্পন করতে যায়, তখন তাকে বাধ্য হয়ে ঐ কারখানারই যন্ত্রাংশ হয়ে যেতে হয়। কেননা দুনিয়ায় ঐ একটা কারখানাই চালু আছে এবং তাহলো ইউরোপীয় সভ্যতার কারখানা। এছাড়া আর কোন কারখানা চালু নেই। খোদাবিমুখ সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই সর্বব্যাপী আধিপত্যের আওতায় খোদামুখী জীবন-দর্শন, চারিত্রিক আদর্শ ও জীবন লক্ষ্যের মন-মগজে স্থান পাওয়াই কঠিন। কেননা যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার সমগ্র বিন্যাস প্রক্রিয়া ও বাস্তব জীবনের গোটা গতিধারাই তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে ধাবমান। কিন্তু কিছু লোক যদি এমন অবস্থাতেও মন-মগজে খোদায়ী জীবনাদর্শের বীজ ধারণ করে তথাপি আশে-পাশের গোটা পরিবেশ তাদেরকে অংকুরোদগমে সাহায্যে করতে অস্বীকার করে। চলতি জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে যেমন তারা সমর্থন পায় না, জীবন-সংক্রান্ত তৈরী ও বাস্তব রূপ কাঠামোও যেমন তাদের সহযোগিতা করে না, তেমনি দুনিয়ার চলতি ঘটনাবলীতেও কোথাও তার স্থান হয় না। বিগত পাঁচশো বছরে মানব-জাতি যত জ্ঞান লাভ করেছে, তাকে বিন্যস্ত করা ও তার সমন্বয়লব্ধ জ্ঞান থেকে সিদ্ধান্ত ও মতামত গ্রহণের যাবতীয় কাজ খোদাবিমুখ লোকদের দ্বারাই হয়েছে। খোদার আনুগত্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে তার বিন্যাস ও তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ আদৌ হয়নি। যে সব জাগতিক ও প্রাকৃতিক শক্তি এই সুদীর্ঘ সময়ে মানুষের আয়ত্বে এসেছে এবং জড় বিজ্ঞানের অধিকতর আবিষ্কার উদ্ভাবন দ্বারা যা কিছু সুফল অর্জিত হয়েছে তার দ্বারাও খোদার অনুগত লোকেরা কাজ নেয় নি। কাজ নিয়েছে কেবল খোদাদ্রোহীরা। এজন্য মানবীয় সমাজ ও সভ্যতায় এগুলোর প্রয়োগ ক্ষেত্র নির্বাচনের প্রশ্ন যখন উঠবে তখন ইউরোপীয়দের জীবন-লক্ষ্য ও নৈতিক আদর্শের সাথে যা সামঞ্জস্যশীল, তাই নির্বাচিত হবে। এটাই স্বাভাবিক ও অনিবার্য। সমষ্টিগত জীবনের কার্যকলাপ সংগঠনের জন্য পাঁচশো শতাব্দীতে যেসব আদর্শগত ফর্মূলা চিন্তা করা হয়েছে এবং যেসব বাস্তব কর্মপন্থা কার্যকরী করা হয়েছে, তাও কোন খোদানুগত মানুষের চিন্তা ও কর্মের ফসল নয়। ওগুলোর পরিকল্পনাকারী ছিল খোদাদ্রোহীদের মন-মগজ এবং তা পরিচালিত হয়েছিল খোদাদ্রোহীদেরই হাতে। এ জন্য তাদের পরিকল্পনাই আজকের সকল মতবাদ ও বাস্তব অবস্থার ওপর ক্রিয়াশীল। খোদার ফরমাবরদারীর ভিত্তিতে প্রস্তুত কোন

নক্শা বা পরিকল্পনা কার্যকরী থাকা তো দূরের কথা, নিছক তাত্ত্বিক আদর্শ বা মতবাদের আকারেও এমন সুবিন্যস্তভাবে বর্তমান নেই যা এ যুগের অবস্থার সাথে সংগতিশীল এবং যা আজকের জীবন জিজ্ঞাসার পুরোপুরি জবাব দিতে সক্ষম।

এমতাবস্থায় খোদার আনুগত্যের আদর্শে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি যদি সংসার বৈরাগী হয়ে সমাজ সংস্কার থেকে বিচিছন্ন হয়ে কোন নির্জন জায়গায় গিয়ে আস্তানা গাড়ে এবং পাঁচশো বছরের আগেরকার অবস্থায় নিজেকে নিক্ষেপ করে তা হলে সেটা ভিন্ন কথা। তা না হলে আজকের দুনিয়ার যে পরিস্থিতি, তাতে একজন মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে গেলেই তার সামনে পদে পদে কেবলই সমস্যা আর সমস্যা দেখা দেয়। অত্যন্ত আদর্শনিষ্ঠ ও খাঁটি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বারবার তাকে জেনে শুনে তার আদর্শের পরিপন্থী চিন্তা ও কর্মে লিপ্ত হতে হয়। নতুন জ্ঞান ও অভিনব তথ্যাবলীর সম্মুখীন হতেই সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এসব তত্ত্ব ও তথ্যকে (Facts) এর মূল উদ্ভাবক, বিন্যস্তকারী ও সিদ্ধান্তকারীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও সিদ্ধান্ত থেকে আলাদা করা এবং স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ভিন্নতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তার পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। এ অসুবিধার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে এই সব নতুন তথ্যের সাথে সাথে তার মূল মতবাদগুলো এবং সিদ্ধান্তগুলোকেও হজম করে ফেলে। সে টেরই পায় না যে, অমৃতের সাথে কি পরিমাণ বিষ সে পান করলো। অনুরূপভাবে জীবনের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে উপনীত হলে সে কোন্ পথ অবলম্বন করবে তা নিয়ে পড়ে যায় উভয় সংকটে। এমন বহু সামাজিক মতবাদ তার মন-মগজকে দখল করে বসে যা মূলত তার মনোপুত আদর্শের পরিপন্থী। মন-মগজকে দখল করে এ জন্য যে, দুনিয়ার সর্বত্র ঐ মতবাদই প্রচলিত ও বিজয়ী। অনেক কার্যকর বিধি-ব্যবস্থা এমন রয়েছে যাকে সে ভুল বুঝেও কেবল তার বিকল্প না পেয়ে গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হয়। নেহায়েত নিরুপায় হয়েই অনেক ভ্রান্ত পথে পা বাড়াতে হয়।

বিপ্লবী নেতৃত্বের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব অনিবার্য ঃ

আমি বর্তমান পরিস্থিতির যে বিশ্লেষণ করলাম তাতে যদি আপনারা কোন ভুল-ত্রুটি দেখতে পান তবে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জানাবেন যাতে আমি তা পুনর্বিবেচনা করতে পারি। কিন্তু যদি এ বিশ্লেষণ সঠিক হয়ে থাকে তবে এ থেকে নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

১- খোদাবিমুখ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের প্রভাবাধীন থেকে খোদামুখী খোদানুগত মত ও আদর্শ বেঁচে থাকতে পারে না। এই মত ও পথে যারা বিশ্বাসী তাদের আকীদা ও ঈমানের সরাসরি দাবীই হলো সেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে উৎখাত করে সেই জায়গায় পৃথিবীতে খোদানুগত নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া।

২- যে শিক্ষাব্যবস্থায় কেবল প্রাচীন ঐতিহ্যলব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখানো হয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটানোর জন্য মানুষকে প্রস্তুত করার কোন শক্তি সেই শিক্ষার নেই। সুতরাং খোদাভীতি ও খোদার আনুগত্যের আদর্শ দুনিয়া থেকে উৎখাত হতে হতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, এ যদি কারো কাম্য হয় তবে সে বর্তমান এই শিক্ষাব্যবস্থাকে খুশী মনে আঁকিড়ে ধরে থাকতে পারে। অন্যথায় এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বদলাতেই হবে।

৩- যে শিক্ষাব্যবস্থা সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আল্লাহর অবাধ্য নেতৃত্বের রচিত ধারাক্রম অনুসারে সাজায় এবং সেই নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে গ্রহণ করে, এবং যে শিক্ষাব্যবস্থা গোমরাহী ও খোদাদ্রোহিতার পথ প্রদর্শকদের বানানো যন্ত্রের নাট্‌বল্টু হিসেবে মানুষকে তৈরী করে, সে শিক্ষাব্যবস্থা আসলে ধর্মান্তরিত করারই পরীক্ষিত ব্যবস্থা। এ জাতীয় কোন শিক্ষাঙ্গনের ওপর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিয়া কলেজ অথবা ইসলামিয়া হাইস্কুল নামের সাইনবোর্ড টাঙ্গানোর মত ধোকাবাজী আর হতে পারে না। এ ধরনের শিক্ষার সাথে দ্বীনিয়াতের কিছু পাঠ্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া শতকরা ৯৫ ভাগ সম্পূর্ণ বৃথা। বাকী ৫ ভাগ স্বার্থকতা অর্জিত হলেও তা শুধুমাত্র এরূপ যে, কিছু লোক একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কুফরীর কাজে আল্লাহর নাম জপতে জপতে চলতে থাকবে।

৪- ইসলামী শিক্ষার সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের লেজুড় জুড়ে দিয়ে সংস্কার সাধণের পরিকল্পনাও মানুষকে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটানোর যোগ্য করতে পারে না। কেননা আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও অন্যান্য যেসব শাস্ত্র ও বিদ্যা আজ রচিত ও সাজানো গোছানো অবস্থায় পাওয়া যায়, সেসবও খোদাদ্রোহী ও খোদাবিমুখ লোকদের গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের ফসল। এসব বিষয়ের প্রণয়ন ধারা বিন্যাসে এর রচয়িতা ও প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী এমন গভীরভাবে বদ্ধমূল যে, বস্তুনিষ্ট তথ্যসমূহকে দার্শনিক চিন্তাজাত মতবাদ ও আদর্শ থেকে আলাদা করা যায় না। আর কল্পিত ধ্যান-ধারণা বিদ্বিষ্ট পক্ষপাতিত্ব, সংকীর্ণতা, প্রবৃত্তিপূজা ও ঝোঁক প্রবণতা থেকে ছাটাই-বাছাই করাও সম্ভব নয়। সম্ভব নয় খোদানুগত দৃষ্টিভঙ্গীতে এগুলো স্বাধীনভাবে সাজানো ও বিন্যস্ত করা এবং তার ভিত্তিতে ভিন্ন মত ও পথ উদ্ভাবন করা। কি ছাত্র, কি শিক্ষক কারো পক্ষেই

এটা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় যদি প্রচীন শাস্ত্রগুলোকে তাদের প্রাচীন ধারাক্রমে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রচলিত নির্দিষ্ট ধারাক্রমে একত্রে মিলিয়ে পড়ানো হয়, তাহলে এ দু' পরস্পর বিরোধী শক্তির সংমিশ্রনে নানা ধরনের অদ্ভুত মিকচার তৈরী হবে। কেউ প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের প্রভাবে অধিকতর প্রভাবিত হলে মৌলবী হয়ে যাবে। কেউবা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে যাবে এবং এভাবে সে হবে ধর্মহীন 'মিষ্টার' অথবা নাস্তিক 'কমরেড'। আবার কেউবা উভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে ভারসাম্যহীন হয়ে 'না ঘরকা না ঘাটকা' হয়ে যাবে। এ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষালাভ করে উভয় শিক্ষার সংমিশ্রন ঘটিয়ে একটা বিশুদ্ধ মিকচার বানাতে পারবে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। আর তা বানাতে পারলেও চিন্তা ও কর্মের জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করা এবং তার গতি ধারাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার মত শক্তি অর্জন করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

অবস্থার পর্যালোচনা করে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি-আমি পুনরায় বলছি, এর মধ্যে কোন ত্রুটি থাকলে আপনারা আমাকে অবহিত করুন। কিন্তু আমার সিদ্ধান্তকে যদি সঠিক বলে মনে করেন তাহলে আমি বলব নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করার একমাত্র পথ হলো, উল্লেখিত তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা শিক্ষা ব্যবস্থা রচনা করা। সে শিক্ষাব্যবস্থা হবে প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ঐ তিন রকম শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

নয়া শিক্ষাব্যবস্থার নীল নক্‌শা

এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার পর আমি এই ইপ্সিত শিক্ষাব্যবস্থার একটা মোটামুটি ধারণা পেশ করছি।

প্রথম বৈশিষ্ট্য ঃ

এই নয়া শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট্য হবে এতে ধর্মীয় ও দুনিয়াবী শিক্ষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মুছে ফেলে উভয় শিক্ষাকে একক শিক্ষাব্যবস্থায় পরিণত করা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ধর্মীয় ও দুনিয়াবী শিক্ষার নামে দুটো আলাদা ভাগে ভাগ করা হয়েছে মূলত দ্বীন-দুনিয়া সম্পর্কে আলাদা ধ্যান-ধারণা থাকার কারণেই। অথচ এই ধারণাটা মূলতঃই অ-ইসলামী। ইসলামের পরিভাষায় যেটা 'দ্বীন' বা 'ধর্ম', সেটা দুনিয়ার জীবন থেকে কোন আলাদা জিনিস নয়। দুনিয়াকে এ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা যে, এটা আল্লাহর রাজ্য এবং নিজেকে আল্লাহর প্রজা মনে করে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর নির্দেশ ও সন্তুষ্টি অনুসারে প্রতিটি কাজ করা এটারই নাম 'দ্বীন'। দ্বীন সম্পর্কে এই ধারণার স্বাভাবিক দাবী হলো, সমস্ত দুনিয়াবী তথা ধর্ম-নিরপেক্ষ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ইসলামিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করা। নচেৎ কতক জ্ঞান-বিজ্ঞান যদি নিছক দুনিয়াবী হয় এবং খোদার আনুগত্যের ধারণার বাইরে থাকে আর কতকগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞান যদি ইসলামী হয় এবং তা পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে আলাদা ভাবে শিক্ষা দেয়া হয় তাহলে একটি শিশু তার শৈশবকাল থেকেই এমন একটি মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠবে যে, তার নিকট দ্বীন ও দুনিয়া দু'টি স্বতন্ত্র জিনিস। এ কারণে এ দুটো জিনিস হবে তার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় এবং এতদোভয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ একক জীবন গঠন করা তার পক্ষে কঠিন হবে, যে জীবনে আল্লাহর দ্বীনের (তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ কর অর্থাৎ সমস্ত জীবনে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত কর) সঠিক প্রতিফলন হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যদি কোন ব্যাক্তিকে ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা; ভূবিদ্যা, মহাশূন্যবিদ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অন্য সমস্ত বিদ্যা এমনভাবে পড়ানো হয় যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও আল্লাহর নাম পর্যন্ত উচচারিত হয় না। বিশ্বপ্রকৃতির দশ দিগন্তে এবং মানুষের নিজ

সত্তায় যত সচেতন ও অচেতন বস্তু রয়েছে সেসবকে আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে দেখা হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীকে মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর রচিত বিধান হিসেবে উল্লেখ করা হয় না, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেয়ার সময় তার পেছনে মহাপরাক্রান্ত ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচছা কার্যকরী থাকার কথা বলা হয় না, ফলিত বিদ্যাসমূহের কোথাও আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসারে কৌশল প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পোষণ করা হয় না, বাস্তব-জীবনের আচার-আচরণ ও কায়কারবারের আলোচনায় আল্লাহ জীবন পরিচালনার যে নিয়ম-পদ্ধতি বেঁধে দিয়েছেন সে নিয়ম-পদ্ধতির বর্ণনাও কোথাও থাকে না, জীবনের উৎপত্তি ইতিবৃত্তে কোথাও জীবন স্রষ্টা আল্লাহর দেয়া সূচনা ও সমাপ্তির বিবরণ সন্নিবেশিত হয় না–তা হলে এত সব বিদ্যা শেখার পর তার মন-মগজে জীবন ও বিশ্বজগত সম্পর্কে যে ধারণা জন্মাবে তাতে আল্লাহর কোন স্থান থাকবে না। প্রতিটি জিনিসের সাথে তার পরিচিতি ঘটবে স্রষ্টাকে বাদ দিয়েই। প্রত্যেক ব্যাপারেই সে খোদা ও তাঁর সন্তুষ্টির পরোয়া না করেই নিজের পথ রচনা করে নেবে। সকল বিদ্যা থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন ও অর্জিত জ্ঞানের এরূপ ধারা-বিন্যাস লাভের পর সে যখন অন্য একটা বিভাগে গিয়ে হঠাৎ খোদার কথা শুনবে এবং দ্বীনিয়াত বিষয়ের আওতায় যে নৈতিক শিক্ষা, শরীয়তী-বিধি-নিষেধ এবং জীবনের মহত্তর লক্ষ্য শিক্ষা দেয়া হয়, তা যখন পাবে, তখন সে বুঝতেই পারবে না যে জীবন ও জগত সম্পর্কে তার অর্জিত জ্ঞান কাঠামোতে খোদা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জিনিসকে কোথায় স্থান দেয়া যায়? প্রথমে খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কেই তার প্রমাণ দরকার হবে। এর পর সে জানতে চাইবে যে, খোদার দেয়া পথ নির্দেশ সত্যিই তা প্রয়োজন কি না এবং তার নিকট থেকে সত্যিই এসেছে কিনা? এসে থাকলে তার প্রমাণ কি? এসবের প্রমাণ দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করা গেলেও তার পক্ষে দুনিয়াবী জ্ঞানের সাথে এই নতুন জিনিসের সামঞ্জস্য বিধান করা খুবই কঠিন হবে। সে যত পাকা ঈমানদারই থাক না কেন এতদসত্ত্বেও ইসলামী জীবন বিধান কখনোই তার জীবনে স্থান পাবে না–এটা হবে তার জীবনের একটা আনুসঙ্গিক বা বাড়তি ব্যাপার মাত্র।

এতসব অকল্যাণ শুধুমাত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাকে ধর্মীয় ও দুনিয়াবী এই দুই ভাগে বিভক্ত করার ফল। আর এভাবে বিভক্ত করাটা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ

বরখেলাফ, সে কথা আমি ইতোপূর্বেই বলেছি। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষার জন্য কোন আলাদা পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন নেই। বরং গোটা শিক্ষাকেই ইসলামী শিক্ষায় পরিণত করা প্রয়োজন। প্রথম থেকেই একটি শিশুকে জগত সম্পর্কে এভাবে শিক্ষা দিতে হবে যে, সে আল্লাহর রাজত্বেরই একজন প্রজা। তার নিজ সত্তায় ও সারা বিশ্বজাহানে আল্লাহরই নিদর্শন দেখতে পায়। তার এবং দুনিয়ার প্রতিটা জিনিসের সম্পর্ক সরাসরি বিশ্ব প্রভুর সাথে-যিনি আকাশ থেকে সকল ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ বিশ্বজগতে যেসব শক্তি ও বস্তু তার আয়ত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন, তা সব আল্লাহই তাকে দিয়েছেন। একমাত্র আল্লাহর মর্জি অনুসারে ও তার নির্দেশিত পথে এগুলোকে ব্যবহার করতে হবে এবং এ জন্য তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের সামনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গী আসাই ঠিক নয়। তবে পরবর্তী স্তরগুলোতে যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তাকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে যে, সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্যের বিন্যাস ও ব্যাখ্যা এবং ঘটনার পটভূমি বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ইসলামী আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গীতেই হবে। কিন্তু তার পাশাপাশি অন্যান্য মতবাদগুলোও যথার্থ সমালোচনা ও যাচাই-বাছাই করে তুলে ধরতে হবে এবং বলে দিতে হবে যে, এগুলো পথভ্রষ্ট ও খোদার গযবে নিপতিত লোকদের রচিত মতবাদ। অনুরূপভাবে বাস্তব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ্যাগুলোর প্রাথমিক পর্যায়েই ইসলামের নির্দেশিত জীবন-লক্ষ্য, নৈতিক নীতিমালা ও কর্ম পদ্ধতির শিক্ষা দেয়া চাই। তবে অন্যান্য মতাদর্শের নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি এমনভাবে পড়াতে হবে যে, সে গুলোর দার্শনিক ও চিন্তাগত ভিত্তি, অভীষ্ট লক্ষ্য ও কর্মপন্থা ইসলাম থেকে কতখানি ভিন্ন এবং কোন্ কোন্ দিক দিয়ে ভিন্ন তা স্পষ্ট হয়ে যায়। সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে রূপ দেয়ার এটাই সঠিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে ইসলামী শিক্ষার জন্য যে আলাদা কোন পাঠক্রমের প্রয়োজন হয় না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ

এ শিক্ষাব্যবস্থার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত এই যে, এতে প্রত্যেক ছাত্রকে সব বিষয়ে শিক্ষিত করে শিক্ষা সমাপ্তির পর 'মাওলানা' বা 'মুফতি' বানিয়ে প্রত্যেককে সকল বিষয়ে মতামত দেয়ার যে রেওয়াজ আজ পর্যন্ত চলে আসছে তার সমাপ্তি ঘটানো। এর পরিবর্তে বিশেষজ্ঞ হিসেবে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা

চালু করা বাঞ্ছনীয়, যা বহু যুগের অভিজ্ঞতায় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। মানুষের জ্ঞান এখন এত বেশী উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং তার এত শাখা-প্রশাখা বেরিয়েছে যে, এর সব কটা একই ব্যক্তির পক্ষে শেখা সম্ভব নয়। আর সব বিদ্যাতেই যদি তাকে মামুলি ধরনের চলনসই জ্ঞান দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সে কোনটাতেই পারদর্শিতা ও পরিপক্কতা লাভ করতে পারবে না। এর চেয়ে বরং আট দশ বছরের পাঠক্রম এমন হওয়া উচিত যে, প্রত্যেক শিশু তার জীবন, জগত ও মানুষ সম্পর্কে মোটামুটি অপরিহার্য জ্ঞান ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে লাভ করতে পারে। বিশ্ব প্রকৃতি তথা বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে একজন মুসলমানের যেরূপ মনোভাব ও ধ্যান-ধারণা জন্মানো দরকার তা যেন তার জন্মে। একজন মুসলমানের জীবন যে ধাঁচের হওয়া উচিত সে নক্শা যেন তার মনে বদ্ধমূল হয়ে যেতে পারে। কর্মজীবনের জন্য যেটুকু তত্ত্ব ও তথ্য একজন মানুষের প্রয়োজন, তা যেন সে লাভ করে এবং সে এই সব তত্ত্ব ও তথ্য যেন একজন খাঁটি মুসলমানের মত প্রয়োগ করতে পারে। মাতৃভাষায় তার পর্যাপ্ত দখল থাকা চাই। সেই সাথে আরবি ভাষাও ততটা শেখা চাই যেন পরবর্তী সময়ের বাড়তি লেখাপড়ায় কাজে লাগে। যে কোন একটা ইউরোপীয় ভাষা ও তার এতটা জানা দরকার যে এই সব ভাষায় যে বিপুল জ্ঞান-ভান্ডার সঞ্চিত রয়েছে তার কিছুটা আহরণ করতে পারে। এরপর বিশেষজ্ঞ হিসেবে শিক্ষার এক আলাদা পাঠ্যক্রম থাকবে, এতে ছয় বা সাত বছরের গভীর তত্ত্বানুসন্ধানের প্রশিক্ষণ নেয়ার পর শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করবে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করছি। এতে আমি বিশেষজ্ঞীয় শিক্ষা সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করি তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

দর্শন ও যুক্তি বিদ্যার জন্য একটা বিভাগ থাকবে। এ বিভাগে শিক্ষার্থীকে আগে কুরআনের দর্শন ও যুক্তি পড়ানো হবে। এতে সে জানতে পারবে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসগুলোর নাগালের ভেতরে সত্য অনুসন্ধানের কি কি পথ আছে, মানুষের বুদ্ধি-বিবেকের দৌড় কতদূর ও তার সীমানা কি এবং শুধু যুক্তির ভিত্তিতে অনুমান করতে গিয়ে মানুষ কিভাবে সত্য ও বাস্তবতার জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আন্দাজ অনুমানের অন্ধকার জগতে হারিয়ে যায়। সে আরো জানতে পারবে যে অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলো সম্পর্কে বাস্তবিক পক্ষে মানুষের কতখানি জ্ঞান প্রয়োজন, এই

প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার জন্য মানুষ তার পর্যবেক্ষণ (Observation) ও যুক্তি-প্রণালীকে কিভাবে ব্যবহার করতে পারে, কি কি অতীন্দ্রিয় বিষয় সে নির্ণয় করতে সক্ষম এবং কি কি বিষয় সম্পর্কে সে সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ সিদ্ধান্তের উর্ধ্বে অগ্রসর হতে সক্ষম নয়, আর কোন্ স্তরে গিয়ে ঐ সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তকে বিস্তারিত সিদ্ধান্তে পরিণত করা ও সাধারণ সিদ্ধান্তকে শর্তযুক্ত সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত করার চেষ্টা ভিত্তিহীন হয়ে যায় এবং তা মানুষকে আন্দাজ অনুমানের অসীম দিগন্তে উদভ্রান্ত করে ছেড়ে দেয়। এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর সুরাহা হয়ে গেলেই দর্শনের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে। এর পর শিক্ষার্থীকে দর্শনের ইতিহাস পড়াতে হবে। এই পর্যায়ে কুরআনী দর্শনের সাহায্যে তাকে সকল দার্শনিক মতবাদ পড়িয়ে দিতে হবে যেন সে নিজেই দেখতে পায় সত্যসন্ধানের খোদাপ্রদত্ত উপায়-উপকরণকে কাজে না লাগিয়ে অথবা ভুল পন্থায় কাজে লাগিয়ে মানবজাতি কিভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে। সে বুঝতে পারবে ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে কিভাবে সে নিজের নাগালের বাইরের জিনিস সম্পর্কে আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তাতে জীবনে কি পরিণতি ঘটেছে। কিভাবে সে নিজেকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও বিবেক-বুদ্ধির সীমানা না জেনে তার ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত বিষয়গুলো নির্ধারণে সময় নষ্ট করেছে। সে জানতে পারবে কোথায় হিন্দু দার্শনিকেরা ভুল করেছে, কোথায় গিয়ে গ্রীক দর্শন পথভ্রষ্ট হয়েছে, কোথায় মুসলিম দার্শনিকগণ কুরআনের নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, বিভিন্ন মতের মুসলিম দার্শনিকগণ শত শত বছর ধরে যে সব বিষয় নিয়ে চিন্তা গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান চালিয়েছেন তার কোথায় কোথায় কুরআনের সীমা লংঘিত হয়েছে এবং কতটা হয়েছে। সে বুঝতে পারবে সুফীতত্ত্বের বিভিন্ন মতবাদের প্রবক্তাগণ সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিস্তারিত করার ও শর্তহীনকে শর্তযুক্ত করার জন্য কিভাবে চেষ্টা করেছেন এবং তা কত ভ্রান্ত ছিল। জানতে পারবে ইউরোপের দার্শনিক চিন্তা কোন্ কোন্ পথ ধরে এগিয়েছে, একই সত্য সন্ধান করতে গিয়ে কত রকমারি মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে এবং এসব মত ও পথে হক কতখানি আর বাতিলের মিশ্রণই বা কতখানি হয়েছে এবং তা কোন্ কোন্ পথ দিয়ে এসেছে। ইউরোপে কি কি অতীন্দ্রিয় দর্শন ও ধারণা-বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে, সেসব ধারণা-বিশ্বাস মানুষের কাজ কর্ম ও স্বভাব চরিত্রের ওপর কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছে এবং আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ দ্বারা চালিত হলে কিভাবে বৃথা

মানসিক পরিশ্রমে সময় নষ্ট করা ও ভ্রান্ত আদর্শের ভিত্তিতে জীবন গড়ার বিপদ থেকে দুনিয়াময় মানুষ রক্ষা পেতে পারতো সেকথাও তারা উপলব্ধি করতে পারবে। এসব বিষয় নিয়ে যথোচিত চিন্তা-গবেষণা ও পড়াশুনার পর শিক্ষার্থী তার লব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করবে। অতঃপর পন্ডিত ও বিদ্যান ব্যক্তিদের পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সে যখন নিজ বিষয়ে পরিপক্ক সাব্যস্ত হবে তখন তাকে দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রী দিয়ে বিদায় করতে হবে।

আর একটা বিভাগ হবে ইতিহাসের। এতে কুরআনের ইতিহাস দর্শন, ইতিহাস অধ্যয়নের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে তার মন যাবতীয় সংকীর্ণতা, একদেশদর্শিতা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যাতে যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যকে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত এবং তা থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত ও মতামত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। সে যেন মানব জাতির ইতিবৃত্ত ও মানব সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতির কাহিনী পড়ে মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতা, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এবং উত্থান-পতন কিভাবে আসে, সে সম্পর্কে স্থায়ী নিয়ম-বিধি উদ্ভাবন করতে পারে। মানব সমাজে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কি পদ্ধতিতে ও কোন বিধি অনুসারে ঘটে তা প্রত্যেক ইতিহাসের ছাত্রকে জানতে হবে। তাকে আরো জানতে হবে কি কি গুণ মানুষকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং কি কি দোষ তার অধঃপতন ডেকে আনে। তাছাড়া তাকে চাক্ষুষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, প্রকৃতির একটা সরল রেখা কিভাবে আদিকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সরল সোজা করে পাতা যা মানুষের উন্নতি ও সুখ-সমৃদ্ধির সঠিক পথ। এই সরল পথ থেকে যে ব্যক্তি ডানে বা বামে সরে গিয়েছে তাকে হয় চপেটাঘাত খেয়ে সেই সরল পথের দিকে আসতে হয়েছে, নয়তো এমনভাবে পরিত্যক্ত হতে হয়েছে যে, কোন চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে নি।

এইভাবে অধ্যয়ন করার পর ইতিহাসের ছাত্ররা যখন জানতে পারবে যে, আল্লাহর আইন কত পক্ষপাতহীন, কত নিরপেক্ষতার সাথে তিনি অতীতের জাতিসমূহের সাথে আচরণ করেছেন, তখন কোন জাতিকেই সে শত্রু বা মিত্র ভাববে না। প্রত্যেক জাতির কীর্তিকলাপে সে নিরপেক্ষ মন, আবেগমুক্ত দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে সফলতা ও ব্যর্থতার চিরন্তন সার্বজনীন কষ্টি পাথরে যাচাই করে খাঁটি ও ভেজালকে আলাদা আলাদা করে দেখিয়ে দেবে। এরূপ মানসিক প্রশিক্ষণের পর তাকে ঐতিহাসিক দলীল-দস্তাবেজ, পুরাকীর্তি ও মূল উৎসগুলো

থেকে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সবক পুনঃ পুনঃ দিতে হবে। এভাবে তাকে এতটা দক্ষ ও পরিপক্ক করে তুলতে হবে যে, সে যেন ইসলাম বিরোধী ঐতিহাসিকদের পক্ষপাতদুষ্ট আবর্জনার স্তুপ থেকে সত্যকে খুঁজে বের করে নিজেই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত পেশ করতে সক্ষম হয়।

আর একটা বিভাগ থাকা চাই সমাজ-বিজ্ঞানের। এ বিভাগের প্রথম কাজ হবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব সভ্যতার মৌলিক নীতিমালা তুলে ধরা। এরপর বিস্তারিতভাবে মৌলনীতি থেকে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপবিধি রচনা করে নবীদের নেতৃত্বে যে সামাজিক ও তামুদ্দুনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার উদাহরণ পেশ করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ঐ মৌল নীতিমালার (Fundamental Principles) ভিত্তিতে কিভাবে একটা সুষ্ঠু ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্র প্রশাসন ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত রচিত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, ঐ একই মৌল নীতিমালার ভিত্তিতে কেমন করে ঐ তামুদ্দুনিক ইমারতের আরো সম্প্রসারণ সম্ভব এবং ইজতিহাদ তথা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ চিন্তা–গবেষণা দ্বারা সম্প্রসারণের কি পরিকল্পনা তৈরী করা সম্ভব তাও দেখিয়ে দিতে হবে। সমাজ বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রের এটাও জানা দরকার যে, মানব সমাজে জ্ঞান–বিজ্ঞানের বিকাশ ও উন্নতি হওয়ার কারণে যেসব নতুন শক্তির আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ঘটে এবং সভ্যতার স্বাভাবিক বিকাশ বৃদ্ধির ফলে যে নতুন ব্যবহারিক কর্মপদ্ধতির উৎপত্তি হয়, সেগুলোকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা তথা বিধিনিষেধের আওতায় ঐ ন্যায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় কিভাবে একান্ত করে নেয়া যায় এবং কিভাবে এগুলোকে বিকৃতির হাত থেকে নিরাপদ রেখে যথাস্থানে স্থাপন করা যায়। তাকে অতীত জাতিগুলোর এবং মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পড়িয়ে দিতে হবে যেন সে বুঝতে পারে, ইসলামের এসব তামুদ্দুনিক মৌলনীতিমালার ও খোদায়ী বিধানের অনুসরণ ও লংঘন কি ফল দর্শায়। অপরদিকে তাকে আধুনিক যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ ও বাস্তব কার্যধারার সমালোচনামূলক অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে খোদাবিমুখ মানুষের মনগড়া মত ও পথ তার জন্য কতখানি কল্যাণকর বা ধবংসাত্মক তাও বুঝতে হবে।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্য কয়েকটা আলাদা বিভাগ থাকা দরকার। এতে কুরআনের নির্দেশের আলোকে এ যাবত কালে আহরিত সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য শুধু যে পর্যালোচনা করতে হবে তাই নয়, বরং কুরআনের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাকৃতিক নির্দেশাবলী ও বিধি-বিধানের আরো পর্যালোচনা ও উদ্ভাবনের কাজও একই দৃষ্টিকোণ থেকে হতে হবে। যদিও কুরআন বিজ্ঞান গ্রন্থ নয় এবং বিজ্ঞানের সাথে তার বিষয়বস্তুরও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই; তথাপি এ কথা সত্য যে, এ গ্রন্থের রচয়িতা যিনি, বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টাও তিনি। তাই তিনি তাঁর একটি গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় নিজেরই আরেকটি গ্রন্থ থেকে নানা দৃষ্টান্ত ও সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করেছেন। এ জন্য এ কিতাব গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে বিজ্ঞানের একজন ছাত্র শুধু বিশ্ব প্রকৃতির বহু মৌলিক নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান জানতে পারে তা-ই নয়, বরং বিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেকটি শাখাতেই সে একটা নির্ভুল সূচনা বিন্দু (Starting Point) এবং তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য একটা সঠিক দিক নির্দেশনা (Direction) লাভ করে। এটি এমন একটি চাবি যার সহায়তায় তার সামনে খুলে যায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক স্বচ্ছ ও সোজা রাজপথ। এই চাবির সহায়তা গ্রহণ করলে বিজ্ঞান গবেষণায় বহু জটিল সমস্যার সমাধান অল্প সময়ে সহজতর পন্থায় পাওয়া যায়। আজকের বিজ্ঞানের পথভ্রষ্টতার একটা বড় কারণ এই যে, বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণে তা নির্ভুলভাবে প্রয়োগ এবং সঠিক তথ্য উদ্ধার করে বটে, কিন্তু সংগৃহীত তথ্যাবলীর সমন্বয় ঘটিয়ে যখন সে সাধারণ নিয়ম বা মতবাদ রচনা করে তখন বিশ্ব প্রকৃতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে হোঁচট খায়। এ কারণে মানবীয় শক্তির অনেক অপচয় হয়। পরিণামে এ ভ্রান্ত মতবাদগুলোকে মানব সভ্যতার সাথে সংযুক্ত ও একাত্ম করে কর্ম জীবন সংগঠন করতে গেলে তা গোটা সভ্যতাকে বিপর্যস্ত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একজন মুসলিম বিজ্ঞানী যখন কুরআনের দিক নির্দেশনার আলোকে প্রমাণিত তথ্যসমূহকে বিদ্যমান মতবাদসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নতুন করে বিন্যস্ত করবে এবং আরো তথ্য আহরণ করে তা দিয়ে শ্রেষ্ঠতর মতবাদ রচনা করবে, তখন দুনিয়াবাসী আজ যে সব বৈজ্ঞানিক বিভ্রান্তিতে লিপ্ত তা বর্জন না করে পারবে না।

যে সব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আজকাল ইসলামী শিক্ষা বলা হয়, তার জন্যও আলাদা আলাদা বিভাগ থাকতে হবে। যেমন একটা বিভাগ থাকবে কুরআনের

গবেষণামূলক অধ্যয়নের জন্য। এতে অতীতের তাফসীরকারদের কৃত তাফসীর পর্যালোচনা করা এবং এ কাজ আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। বিভিন্ন দিক দিয়ে কুরআনী জ্ঞান বিজ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করতে হবে, মানুষের উদ্ভাসিত জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখার সাহায্যে কুরআনে আরো দক্ষতা ও পারদর্শীতা অর্জন করতে হবে। অনুরূপভাবে হাদীসের একটা বিভাগ থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে হাদীসবেত্তাগণ যে কাজ করে গিয়েছেন তা অধ্যয়ন করতে হবে এবং তারপর গবেষণা, সমালোচনা, সংগৃহীত জ্ঞানের সমন্বয় ও বিন্যাস এবং সিদ্ধান্ত ও মতামত গ্রহণের কাজ আরো এগিয়ে নিতে হবে। ইসলামের সোনালী যুগের আরো খুঁটিনাটি তথ্য ও ঘটনা খুঁজে বের করতে হবে এবং তা থেকে এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যা এ যাবত আমাদের জানার বাইরে রয়ে গিয়েছে। ইসলামী আইন-বিজ্ঞান নামে একটা বিভাগ থাকবে। কুরআনের আহকাম (আদেশ-নিষধ) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের তাত্ত্বিক ও বাস্তব ব্যাখ্যা (কওলী ও আমলী) সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের (সাহাবাদের অব্যবহিত উত্তরপুরুষ) ইজতিহাদ বা গবেষণালব্ধ জ্ঞান, ইজতিহাদকারী ইমামদের যুক্তি প্রণালী এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁদের যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যাসমূহের বিস্তারিত ও পুংখানুপুংখ অধ্যয়ন করতে হবে। সাথে সাথে দুনিয়ার প্রাচীন ও আধুনিক জাতিসত্তাসমূহের আইন শাস্ত্র ও আইন বিজ্ঞানও গভীরভাবে পড়তে হবে। এভাবে জীবনের নিত্য পরিবর্তনশীল অবস্থা ও সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে ইসলামী আইনের মূলনীতিসমূহ প্রয়োগ করে ফিকাহ্ শাস্ত্রে অতীত যুগের নির্জীব দেহে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে। এভাবে এই বিভাগসমূহের নিজস্ব অবদানগুলোই শুধু অত্যন্ত ব্যাপক এবং মহৎ হবে না, বরং অন্যান্য বিভাগকেও তা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ সম্পর্কে এমন সব মূল্যবান উপকরণ ও তথ্য সরবরাহ করতে পারবে যার উপর দাঁড়িয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব দিগন্তে গভীর গবেষণা ও উদ্ভাবনের তরংগ সৃষ্টি করা যাবে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ

আমি কয়েকটি বিভাগের কথা উল্লেখ করলাম। উদ্দেশ্য হলো এর দ্বারা যেন পুরো শিক্ষা কাঠামোর বিস্তারিত ও ব্যাপক ধারণা ও নীল নক্শা সহজেই পাওয়া যেতে পারে।

এখন প্রস্তাবিত নয়া শিক্ষাব্যবস্থার সর্বশেষ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করব। সেই বৈশিষ্ট্য হলো, এতে আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার ন্যায় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন শিক্ষার অস্তিত্ব থাকবে না। বরং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের সামনে একটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জীবনোদ্দেশ্য এবং তাদের চেষ্টা সাধনারও একটা চূড়ান্ত উদ্দেশ্য থাকবে। আর তা হলো খোদার আনুগত্যের আদর্শকে দুনিয়ায় বিজয়ী ও নেতৃত্বদানকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের সর্বাত্মক জেহাদ বা সংগ্রাম চালাতে হবে। মানব দেহের প্রতিটি ধমনী ও শিরা-উপশিরায় যেমন রক্ত প্রবাহিত হয়ে তাকে সতেজ ও কর্মতৎপর রাখে, এই শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও ঠিক সেই লক্ষ্যই পূরণ করবে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তি জীবন, তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও মেলামেশায়, তাঁদের খেলাধূলা ও বিনোদন, তাদের শ্রেণী কক্ষের লেখা-পড়ায় এবং গবেষণা ও অধ্যয়নের সকল তৎপরতায় জীবনের এই লক্ষ্যই সক্রিয় থাকবে। এই লক্ষ্যের আলোকেই তাদের জীবন ও জীবনের কর্মনীতি বিরচিত হবে। এই ধাঁচেই তাদের চরিত্র গড়ে তোলা হবে। মোট কথা শিক্ষা পরিবেশ এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ইসলামের এক একজন নিবেদিত প্রাণ সৈনিকে পরিণত করবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল

এ ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পেয়ে যারা তৈরী হবে তাদের ভেতর চিরাচরিত ও গতানুগতিক স্রোতধারাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার মত শক্তি থাকবে। তাদের জ্ঞানগর্ভ ও চুলচেরা সমালোচনা সব অ-ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার ভিতে ধ্বস নামিয়ে দেবে। তাদের উদ্ভাবিত জ্ঞান-বিজ্ঞান এত শক্তিশালী হবে যে, আজ যারা জাহেলিয়াতের দৃষ্টিভঙ্গী আঁকড়ে ধরে আছে, তাদেরকে তারা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে ফিরিয়ে আনবে। তাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুফল ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের মত উন্নত দেশকেও প্রভাবিত করবে এবং বিবেকবান প্রতিটি মানুষ সবস্থান থেকেই তাদের এই ধ্যান-ধারণাকে গ্রহণ করতে ছুটে আসবে। তাদের বিরচিত জীবন দর্শন ও জীবন পদ্ধতি এমন প্রবলভাবে চিন্তা মতবাদের জগতে প্রভাব বিস্তার করবে যে, বাস্তবে বিরুদ্ধ কোন জীবন দর্শনের পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখাই অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে। এ ছাড়াও এ শিক্ষা দ্বারা এমন চরিত্রবান ও কৃতসংকল্প লোক গড়ে উঠবে, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের জগতে কার্যকর বিপ্লব সৃষ্টির জন্য যাদের প্রয়োজন অপরিহার্য। তারা হবে এ বিপ্লবের সুনিপুণ কুশলী। এ বিপ্লব সৃষ্টির জন্য তাদের আগ্রহও থাকবে অদম্য। আর এ বিপ্লবী আন্দোলনকে বিশুদ্ধ ও ইসলামী প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে পরিচালনা করার যোগ্যতাও তাদের থাকবে। অবশেষে সফলতার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে তারা ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতির ভিত্তিতে একটা রাষ্ট্র একটা পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা, কৃষ্টি ও সমাজ ব্যবস্থা সহকারে কায়েম করবে। সে রাষ্ট্রের আকৃতি ও প্রকৃতি হবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী এবং সারা দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা ও ক্ষমতা তার থাকবে।

বাস্তব সমস্যা

এ পর্যায়ে তিনটি কঠোর বাস্তব সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায়। আমার মনে হচেছ, আমার এ বক্তব্য শোনার সময়ে এ প্রশ্নগুলো আপনাদেরকে ইতোমধ্যেই বিব্রত করতে শুরু করে দিয়েছে।

পাঠ্যসূচী ও শিক্ষক সংগ্রহ ঃ

প্রথম প্রশ্ন হলো ঃ এ শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের উপায় কি? কারণ এই নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানকারী শিক্ষকও যেমন বর্তমানে কোথাও পাওয়া যাবে না, ঠিক তেমনি এই নতুন পরিকল্পনা অনুসারে কোন একটা বিষয় শিক্ষা দেয়ার মত বই পুস্তকও বর্তমানে কোথাও নেই। বরং একথা বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, প্রথম শ্রেণীর ছাত্রকেও এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়ার জন্য কোন শিক্ষক বা পাঠ্যপুস্তক পাওয়া বর্তমানে দুষ্কর। এ প্রশ্নের জবাব হলো, একটা ভবন নির্মাণ করতে যেমন ইট পাকানোর ভাটা তৈরী করতে হয়, তেমনি একটা নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বানানো একান্ত প্রয়োজন, যাতে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষক তৈরী করতে পারা যায়। ইটতো এমনি এমনি পাওয়া যায় না। ভাটায় পুড়িয়ে তৈরী করে নিতে হয়। অনুরূপভাবে শিক্ষক রেডিমেড পাওয়া যাবে না, তৈরী করতে হবে। তবে প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষালাভ করে এমন কিছু লোক বেরিয়েছে যারা হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর মত সহজাত ইসলামী স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী। তারা বিভিন্ন স্তরে অ-ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষালাভ করেও নিজেদের ঈমান রক্ষা করতে পেরেছেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন-লক্ষ্য ইসলামী কিংবা সামান্য চেষ্টা সাধনার দ্বারাই খালেছ ইসলামী ভাবাপন্ন করা সম্ভব। জীবনের যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে তারা বিশ্বাসী, তার পথে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের মত মনোবলও তাদের আছে। গবেষণা তথা ইজতিহাদ করার মত যোগ্যতাও তাদের মধ্যে বর্তমান। এ ধরনের লোকদেরকে যদি বিশেষ ধরনের নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দেয়া যায়, যে ধারাক্রমে তাদের মন-মগজে এ যাবত বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য পুঞ্জিভূত হয়ে আসছে যদি তা একটু কৌশলে পাল্টে দেয়া যায় এবং দৃষ্টিভঙ্গী যদি একটু ভালো করে ইসলামমুখী করা যায়, তা হলে এই সব লোকই পড়াশোনা ও চিন্তা-গবেষণা দ্বারা এতটা যোগ্য ও দক্ষ হতে পারে যে, আমার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুসারে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নতুন ধারায় বিন্যস্ত করে সংকলন করতে পারবে। অতঃপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই নবতর বিন্যাস ও সংকলন যখন খানিকটা সম্পন্ন হবে, তখন প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য নমুনা স্বরূপ একটা শিক্ষাঙ্গন গড়া যেতে পারে।

ছাত্র সংগ্রহ ঃ

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, এ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়িত করা গেলেও তাতে ছাত্রদের আকর্ষণ করার কি এমন মোহনীয় বিষয় থাকবে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত সভ্যতা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সেবা করার জন্য নয় বরং তার বিরুদ্ধে লড়াই করার

জন্য তৈরী হয়েছে সে শিক্ষাব্যবস্থায় যারা অংশ গ্রহণ করবে তারা কিছুতেই এ আশা করতে পারে না যে, ওখান থেকে শিক্ষা লাভ করে বেরিয়ে তারা কিছু অর্থোপার্জন করতে পারবে। এমতাবস্থায় ক'জন লোক এমন পাওয়া যাবে যারা অর্থোপার্জনের পরোয়া না করে এমন শিক্ষা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসবে যে শিক্ষা শেষে পার্থিব দৃষ্টিতে কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যত নেই?

এর জবাব হলো, এ শিক্ষা ব্যবস্থার সত্য ও ন্যায়ের মোহিনী শক্তি ছাড়া আর কোন আকর্ষণ নেই এবং এরূপ কোন আকর্ষণের দরকার নেই। যাদের মন এদিকে আকৃষ্ট হয় না, শুধু পার্থিব ভোগ উপকরণই যাদের আকৃষ্ট করতে পারে, তাদের এদিকে আকৃষ্ট না হলেও চলবে। এ শিক্ষা যাদের প্রয়োজন নেই, এ শিক্ষাও তাদের মনোযোগের মুখাপেক্ষী হবে না। এর জন্য প্রয়োজন এমন সৎলোকের যারা জেনে বুঝে এই লক্ষ্যে ও এই কাজের জন্য নিজেদের ও নিজেদের সন্তানদের জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে। এ ধরনের লোক একেবারেই বিরল নয়। সারা ভারতবর্ষ থেকে কি পঞ্চাশটা শিশুও এ জন্য পাওয়া যাবে না! যে জাতি যুগের পর যুগ ধরে ইসলাম ইসলাম করে আর্তনাদ করেছে সে জাতি কি এ কয়টি শিশুও যোগান দিতে পারবে না! না পারলেও কিছু আসে যায় না। এরূপ হলে আল্লাহ অন্য জাতিকে এ সৌভাগ্য ও সুযোগ দান করবেন। আর যে দেশের মানুষ নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করে তারা যদি ইসলামী শিক্ষার জন্য অল্প কিছু সংখ্যক শিশু সংগ্রহ করে দিতে না পারে তা হলেও ক্ষতি নেই। আল্লাহ এ সৌভাগ্য অন্য জাতিকে দেবেন।

অর্থ সংগ্রহের প্রশ্ন ঃ

সর্বশেষ প্রশ্ন হলো, এ কাজ সম্পাদনের জন্য অর্থ কোথায় পাওয়া যাবে? এর সংক্ষিপ্ত জবাব হলো, যাদের অর্থ আছে, ঈমানও আছে এবং অর্থ ব্যয় করার সঠিক খাত বুঝার মত বিবেক-বুদ্ধিও আছে তাদের কাছ থেকেই প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যাবে। যারা দিন-রাত ইসলামের জন্য কাতরাচ্ছে তাদের মধ্যে এমন লোকও যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমি বলবো তাতেও কোন পরোয়া নেই। আল্লাহ তা'য়ালা অন্য জাতির মধ্য থেকেই এমন লোক তৈরী করে দেবেন। ইসলামের সোনালী যুগেও তো কুফর ও শিরকের ক্রোড় থেকেই এমন সব আল্লাহর বান্দার উদ্ভব ও আগমন ঘটেছিল, যাদের আর্থিক কোরবানীর বদৌলতে ইসলাম দুনিয়াতে প্রসার লাভ করেছিল।

(তরজমানুল কুরআন, শাওয়াল-জিলকদ, ১৩৫৯ হিজরী)

উচ্চ শিক্ষার ইপ্সিত মান

[মাওলানা মওদূদীর নয়া শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত উল্লেখিত ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার মান নির্ণয়ের লক্ষ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে ১৯৪৪ সনে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির প্রথম বৈঠক বসে ঐ বছরেরই ১৪ই আগষ্ট ভারতের পাঠানকোটে। এই বৈঠকে মাওলানা তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে নমুনা স্বরূপ পাঁচটি বিষয়ের উপর শিক্ষার মান পেশ করেন। নিচে ধারাবাহিকভাবে এগুলো পেশ করা হলো।]

জ্ঞান বা বিদ্যাগত মান ঃ

উচচ শিক্ষার ফ্যাকাল্টিগুলো নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

(১) **দর্শন ঃ** ইতিহাস দর্শন-দর্শনশাস্ত্র মুসলিম দার্শনিকদের বিভিন্ন মতবাদ ও চিন্তাধারা, অ-মুসলিম দার্শনিকদের বিভিন্ন মতবাদ ও চিন্তাধারা, আকীদা বা কালাম শাস্ত্র, সুফীবাদ, যুক্তিবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, তাত্বিক বিজ্ঞান, কুরআনের বিজ্ঞান ও তার সমর্থক হাদীস।

(২) **ইতিহাস ঃ** ইসলামের ইতিহাস, মুসলমানদের ইতিহাস, বিশ্বের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, বিপ্লবের ইতিহাস, ইতিহাস দর্শন, সমাজতত্ত্ব (Sociology), বিভিন্ন সমাজতাত্বিক দর্শন, পৌর-বিজ্ঞান (Civics), রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও বিশ্বের শাসনতন্ত্রসমূহ, ইসলামী ইতিহাস দর্শন ও সমাজ দর্শন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধ্যয়ন কুরআন ও হাদীসের আলোকে।

(৩) **অর্থনীতি ঃ** অর্থনীতি শাস্ত্র, বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতবাদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতাদর্শ, দুনিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আর্থিক ক্রিয়াকান্ড (Finance) ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা (Banking) এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্ অধ্যয়ন।

(৪) **আইন শাস্ত্র ঃ** আইনের উৎপত্তির ইতিহাস, আইনের বিধান, প্রাচীন ও আধুনিক জাতিসমূহের আইন কানুন, বিচার ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থার মূলনীতি ও তার সংগঠন। এ ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী মাযহাব সমূহের আইন কানুন অধ্যয়ন করতে হবে।

(৫) **ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ঃ** আরবী ভাষা ও সাহিত্য। তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ্, ইসলামের ব্যবহারিক আইনের ইতিহাস, মুসলিম চিন্তাধারার ইতিবৃত্ত, দুনিয়ার প্রচলিত ধর্মসমূহের তুলনামূলক অধ্যয়ন, বিশ্বের ধর্মসমূহের ইতিহাস, ধর্ম দর্শন, আধুনিক যুগের ধর্মীয় ও নৈতিক আন্দোলনসমূহ এবং পাশ্চাত্যের নাস্তিকতাবাদের ইতিহাস।

নৈতিক ও মানসিক মান ঃ

উল্লেখিত বিদ্যাগত ও জ্ঞানগত মান অর্জন করার সাথে সাথে শিক্ষার্থীকে নিম্ন লিখিত বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলীতে সজ্জিত হতে হবে ঃ

(১) চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানসিকতার দিক দিয়ে পূর্ণ ও পরিপক্ক মুসলমান হবে এবং ইসলামের জন্য গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রবল আগ্রহ পোষণ করবে।

(২) ইসলামের গভীর জ্ঞান অর্জন ও স্বাধীন চিন্তা-গবেষণা করার (ইজতিহাদ) যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন হবে। দুনিয়ার বিকারগ্রস্ত সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে তার জায়গায় একটা সুস্থ, সুন্দর ও ন্যায়সঙ্গত সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যে যোগ্যতা ও প্রতিভার প্রয়োজন, তা তাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে হবে।

(৩) শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক ট্রেনিং এরূপ উন্নত মানের হবে যে, সমসাময়িক পৃথিবী জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

(৪) কুরআন ও হাদীসে যে সমস্ত চারিত্রিক দোষকে কাফের, ফাসেক ও মোনাফেকদের বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাকে ঈমানের পরিপন্থী, ইসলামের বিরোধী এবং সুস্থ ও ন্যায় নীতি ভিত্তিক সমাজের জন্য অশোভন বলে অভিহিত করা হয়েছে, তা থেকে তারা হবে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এমন সব নৈতিক গুণাবলীর লালন ও সমাবেশ ঘটা চাই, যা কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের, পরহেজগারদের, সত্যবাদীদের, নেককারদের, মুমিনদের, সৎকর্মশীলদের, সফলকাম ও কামিয়াব লোকদের বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(৫) তাদের চরিত্র ও মনোবল এমন বলিষ্ঠ হবে যে, তারা দুনিয়ায় নিজের পায়ে ভর করেই দাঁড়াতে পারবে। তাদের মধ্যে প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রেই টিকে থাকার ক্ষমতা থাকবে, কোন ক্ষেত্রেই পরাভব স্বীকার করবে না। তারা কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করে সংগ্রামে এগিয়ে যাওয়ার পথ করে নিতে সক্ষম হবে এবং কঠোর পরিশ্রম দ্বারা যে কোন পরিবেশে নিজেদের জীবিকা উপার্জনের যোগ্যতা তাদের থাকবে।

এ হলো আমাদের পরিকল্পিত নয়া শিক্ষা ইমারতের উপরের গাঁথুনি (Super Stucture)। শেষ পর্যন্ত আমাদের এই ইমারতই নির্মাণ করতে হবে। এই বিশাল প্রাসাদকে ধরে রাখার জন্য যে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, তাতে নিঃসন্দেহে নিম্ন লিখিত বিভাগগুলোর জ্ঞানগত প্রস্তুতি অপরিহার্য হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার অভিষ্ট লক্ষ্য

সাধারণ ঃ (১) আরবী ভাষা, ইংরেজী অথবা অন্য যে কোন ইউরোপীয় ভাষায় এতটা দক্ষ বানাতে হবে যা গবেষণামূলক অধ্যয়নের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

(২) কুরআনের গষেণামূলক অধ্যয়নের প্রাথমিক প্রস্তুতি।

(৩) উসূলে হাদীস এবং কোন সংক্ষিপ্ত হাদীসগ্রন্থের গবেষণামূলক অধ্যয়ন করার যোগ্যতা সৃষ্টি, যাতে শিক্ষার্থীর জন্য ভবিষ্যতে আরো গভীর গবেষণামূলক অধ্যয়নের পথ উন্মুক্ত হয়।

সহায়ক ও প্রাথমিক স্তরের জ্ঞান দান করতে উচচ শিক্ষার স্তরে গিয়ে শিক্ষার্থী যেসব বিষয়ে এগুলো নিয়ে গবেষণা করবে। যেমন ঃ

(১) দর্শন বিভাগের জন্য প্রাথমিক যুক্তিবিদ্যা, প্রাথমিক দর্শন, প্রাচীন ও আধুনিক উভয়টিকেই পড়াতে হবে এবং আকীদা শাস্ত্র বা ইলমে কালাম এর প্রত্যেকটি বিষয়ে এক একখানা বই পড়িয়ে দিতে হবে যা এতদসংক্রান্ত পরিভাষা, বাচনভঙ্গি ও মৌলিক বিষয়াবলী জানার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। তাছাড়া মনস্তত্ব, পদার্থবিদ্যা ও ইত্যাকার প্রত্যেকটি বিষয়ে এক একখানা প্রাথমিক বই পড়াতে হবে।

(২) ইতিহাস বিভাগের জন্য পৌরবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাস সংক্রান্ত এমন একটা পাঠ্যসূচী থাকবে যা দ্বারা ছাত্ররা ইতিহাসে গবেষণা এবং সভ্যতা ও সভ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের গভীরে ঐ সব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে জানতে পারবে এবং এ সব বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিফহাল হবে।

(৩) অর্থনীতি বিভাগের জন্য এমন কোর্স থাকবে যা দ্বারা ছাত্ররা মানব সমাজের গঠন ও কাঠামো এবং তার মৌল সমস্যাগুলোকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে পারবে। অতঃপর অর্থনীতি, আর্থিক লেনদেন, ব্যাংকিং এবং অর্থনৈতিক কায়-কারবার ও লেন দেনের মূলনীতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া ছাড়াও বর্তমান যুগের অর্থব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ সম্পর্কে মোটামুটি অবহিত হতে পারবে।

(৪) আইন বিভাগের জন্য আইন-বিজ্ঞান, ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি (উসূলে ফিকাহ), আইনের ইতিহাস ও ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে একখানা

প্রাথমিক বই পড়াতে হবে এবং চারটি মাযহাবের মাসলা-মাসায়েলের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন থাকতে হবে।

(৫) ইসলামী শিক্ষা বিভাগের জন্য আরবী ভাষার একটা অতিরিক্ত পাঠ্যসূচী থাকবে, যা মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তাবিত সাধারণ শিক্ষাসূচী থেকে আলাদা হবে। তা ছাড়া ফিকাহ ও ফিকাহশাস্ত্র প্রণয়নের ইতিহাস সম্পর্কে একখানা বই এবং তুলনামূলক ধর্ম অধ্যয়নের জন্য একখানা বই থাকবে যাতে বিভিন্ন ধর্মমতের উৎপত্তির ইতিহাসও সন্নিবেশিত হবে।

উল্লেখিত উচচতর স্তর দুটিকে সামাল দেয়ার জন্য যেখান থেকে নির্মাণ শুরু হবে তার বিস্তারিত দিকগুলো খুবই চিন্তা ভাবনা করে তৈরী করতে হবে যেন ভিত্তি খুব মজবুত হয় এবং ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানগত এবং নৈতিক উভয় ক্ষেত্রে সুসভ্য ও রুচিবান মানুষ এবং ইসলামী আন্দোলনের জন্য উন্নত মানের কর্মী সুলভ অত্যাবশ্যক গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। যে সব ছাত্র প্রাইমারী পর্যায়ে লেখাপড়া করেই ক্ষান্ত হবে তারা যেন মৌলিক মানবীয় ও ইসলামিক গুণাবলীর দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ থেকে না যায় এতটা মৌলিক শিক্ষা ও ট্রেনিং দিয়ে ছাড়তে হবে। একটা সুসভ্য ও রুচিবান সমাজের সক্রিয় সদস্য হবার জন্য যেসব যোগ্যতা অপরিহার্য তাও যেন তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে এটা নিশ্চিত করা চাই। এ জন্য কত সময় দরকার বা একে কয়টা স্তরে ভাগ করা দরকার সেটা বিশেষজ্ঞরা স্থির করবেন। আমি শুধু এতটুকু বলব যে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেসব যোগ্যতা ও গুণাবলী দেখতে চাই সেই কাংখিত মান সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে ঐ মানের শিক্ষার্থী তৈরীর জন্য আমাদের কত সময় এবং কি কি সাজ-সরঞ্জাম দরকার হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় মান

নৈতিক শিক্ষা ঃ

(১) শিষ্টাচার, পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ভালো-মন্দবোধ, সুরুচি। সচ্চরিত্র-ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে।

(৩) শৃংখলা, সভ্য ও ভদ্রোচিত এবং স্বাধীনভাবে সমাজে বসবাস করা ও কাজ করার পদ্ধতি, আত্মসমালোচনার অভ্যাস, কর্তব্যপরায়নতা, দায়িত্ববোধ।

(৪) উদার মানসিকতা, দৃষ্টির প্রশস্ততা, চিন্তার ব্যাপকতা, সাহসিকতা ও আত্মমর্যাদা বোধ।

(৫) সংকল্প ও ইচ্ছার দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য ও আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, প্রত্যেক ব্যাপারে কথা ও কাজের বৈপরীত্য ও কপটতা পরিহার।

(৬) সাহসিকতা, বীরত্ব, কষ্টসহিষ্ণুতা, কর্মতৎপরতা ও সতর্কতা, সবধরনের কাজ করার যোগ্যতা, জীবনের সবদিক ও বিভাগ সম্পর্কে কিছু না কিছু জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা।

(৭) ইসলামী লক্ষ্যের প্রতি অদম্য আগ্রহ এবং গভীর ইসলামী উদ্দীপনা যা অন্তরের অন্তস্থলে প্রোথিত এবং যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে শিশু কিশোরদের প্রতিটি চাল-চলনে ও হাবভাবে।

(৮) ইসলামী ওজন ও পরিমাপক (Islamic standard of weights and measures) দ্বারা সব জিনিস মাপা ও ওজন করার অভ্যাস।

(৯) সাংগঠনিক ও সংঘবদ্ধ জীবনের জন্যে কুরআন ও হাদীসে যেসব অত্যাবশ্যক গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে সেসব গুণাবলী।

(১০) প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা।

(১১) গবেষণা, অনুসন্ধান এবং চিন্তা ও পর্যবেক্ষণের অভ্যাস, চোখ-কান খোলা রেখে অর্থাৎ সদা সতর্ক ও সচকিতভাবে দুনিয়ায় বাস করা, যথাযথভাবে চিন্তা-ভাবনা করা, প্রমাণ ও যুক্তি দর্শানো এবং পরখ করা।

বাস্তব ট্রেনিং ঃ

(১) নৌচালনা, সাঁতার, তলোয়ার ও বন্দুক চালনা, ঘোড় সওয়ারী ও সাইকেল চালনা।

(২) খন্তি-কোদাল, হাতুড়ি-বেলচা, করাত, নির্মাণ সামগ্রী ইত্যাদির ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া, প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করা।

(৩) বাজার থেকে মালপত্র কেনা ও নিঃসংকোচে নিজের মাল-পত্র বিক্রি করার যোগ্যতা অর্জন করা।

(৪) হোষ্টেল ও বাসস্থানের ব্যবস্থাপনা, কোন বড় সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা ও কোন বড় দলের ভ্রমণের ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা।

(৫) অফিস সংক্রান্ত কাজ কর্মে অভিজ্ঞতা অর্জন ও বাণিজ্যিক চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের অনুশীলন।

(৬) বক্তৃতা, প্রবন্ধ লেখা, প্রচার কার্য চালানো, আলাপ আলোচনা চালানো স্বমতে আগ্রহী করার মত কথাবার্তা বলা বা ক্যানভাস করার যোগ্যতা।

(৭) খাদ্য রান্না করা, কাপড় কাটা ও সেলাই করার কিছু যোগ্যতা থাকা।

জ্ঞানগত ঃ

(১) **মাতৃভাষা ঃ** মাতৃভাষা বিশুদ্ধভাবে লিখতে ও সব ধরনের বই পুস্তক পড়তে ও বুঝতে পারা এবং লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে সক্ষম হওয়া।

(২) প্রাথমিকভাবে আরবী এতটা শেখা যেন কুরআনের অর্থ মোটামুটি বুঝতে পারে।

(৩) ফারসী গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁ পড়তে পারার যোগ্যতা।

(৪) ইংরেজীর প্রাথমিক জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান লাভের জন্য যেসব বিদ্যা মাতৃভাষায় পড়ানো হবে, সেসব বিদ্যার প্রাথমিক বই ইংরেজীতে পড়তে, বুঝতে ও অনুবাদ করতে পারা।

(৫) **প্রাথমিক অংক শাস্ত্র ঃ** বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন এবং মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হতে পারে গণিত বা অংক শাস্ত্রে এতটুকু জ্ঞান থাকা।

(৬) **ভূগোল ঃ** প্রাকৃতিক ভূগোল, গোটা পৃথিবীর মোটামুটি ভৌগোলিক জ্ঞান, কুরআনিক ভূগোল ও নিজ দেশের ভৌগলিক জ্ঞান।

(৭) **ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস ঃ** নবীদের ও মুসলিম মনীষীদের জীবন-কাহিনী, মাতৃভূমির প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক জ্ঞান।

(৮) ইসলামী আকীদা, আখলাক, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ধারণা থাকা। অন্তর্ভুক্ত ফিকাহ সম্পর্কে অত্যাবশ্যকীয় বিস্তারিত জ্ঞান থাকা যা একজন মুসলিমের ধর্মীয় জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়।

(৯) **স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ঃ** শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ, শরীরবিদ্যা (Physiology), পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূ-বিদ্যা, মোট কথা নিজ দেহ, সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে অপরিহার্য জ্ঞান।

(১০) **ড্রয়িং, স্কেল ড্রয়িং ঃ** মডেল ড্রয়িং, ফ্রিহ্যান্ড পেইন্টিংএ পরিচ্ছন্নতা, নির্ভুলতা, সুরুচি এবং মানচিত্র অংকন ও মানচিত্র পঠনের যোগ্যতা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা

যারা আধুনিক শিক্ষায় অথবা মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত, তাদেরকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে চারিত্রিক ও জ্ঞানগত উভয় দিক থেকে তৈরী করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচচ শিক্ষার একটা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এতে দুটো সুফল ফলবে। প্রথমত ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উচচ মানের কর্মী ও নেতার একটা বাহিনী অল্পদিনের মধ্যেই হস্তগত হবে। দ্বিতীয়ত ঃ এই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থায় যাদের গড়ে তোলা হবে তারাই প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক ও উচচ শিক্ষার বিভাগগুলোতে শিক্ষালাভ, শিক্ষকতা ও পাঠ্য বই প্রণয়নের কাজ করতে পারবে। পরবর্তী সময়ে এই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাকে সামান্য রদবদল করে উচচ শিক্ষার একটা স্থায়ী বিভাগে পরিণত করা যাবে। যারা প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর এই শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাঙ্গনে অতিবাহিত করেনি, বরং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এই দুই স্তর অতিক্রম করে এসেছে তাদেরকে উচচ শিক্ষার বিভাগসমূহে ভর্তি করার জন্য প্রস্তুত করা যাবে।

এই অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষার পাঠ্যসূচী, মেয়াদ ও স্তরসমূহ নির্ণয় করার কাজ আমি বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দিয়ে কেবল এই শিক্ষার মান সম্পর্কে কিছু বলেই শেষ করছি। এ শিক্ষা সমাপ্তির পর ছাত্রদের মধ্যে নিম্নবর্ণীত যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন।

প্রয়োজনীয় মান ঃ

১- কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে এতটা ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা সৃষ্টি হওয়া দরকার যেন শিক্ষার্থীরা জীবনের বিভিন্ন সমস্যায় আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহর সুন্নাত থেকে পথনির্দেশ লাভ করতে পারে।

২- ইসলামী ফিকাহ্ বা আইন সম্পর্কে এতটা জ্ঞান লাভ করতে হবে যেন বিভিন্ন মাযহাবে কুরআন ও সুন্নাহর মূল উৎস থেকে যেসব মূলনীতি অনুসরণ করে শরীয়তের বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়, সেসব মূলনীতি এবং তাদের যুক্তি প্রমাণ ছাত্ররা আত্মস্থ করতে পারে।

৩- প্রাচীন যুক্তি শাস্ত্র সম্পর্কে এতটা জ্ঞান লাভ করা চাই যেন ছাত্ররা প্রাচীন যুক্তি শাস্ত্রবিদদের লিখিত বই–পুস্তক পড়ে জ্ঞানোদ্ধার করতে পারে এবং আধুনিক যুক্তি শাস্ত্র সম্পর্কে এতটা জ্ঞান লাভ করা চাই যেন ছাত্ররা আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পটভূমি ভালো করে বুঝতে পারে।

৪- সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে এতটা জ্ঞান অর্জন করা চাই যেন ছাত্ররা আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সমালোচকের দৃষ্টিতে ভালোভাবে বুঝতে পারে।

৫- বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান ঃ নবুওয়াত যুগ ও খিলাফতে রাশেদার ইতিহাস এবং উপমহাদেশ ও ইউরোপের আধুনিক যুগের ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

শিক্ষা কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক ও গৃহীত সিদ্ধান্ত

১৯৪৪ সালের ১৫ আগষ্ট শিক্ষা কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

শিক্ষাকাল ঃ

(১) সর্বমোট শিক্ষাকাল হওয়া উচিত চৌদ্দ বছর। এই চৌদ্দ বছর নিম্ন লিখিত স্তর সমূহে বিভক্ত হবে ঃ

(ক) প্রাথমিক স্তর ৮ বছর
(খ) মাধ্যমিক স্তর ২ বছর
(গ) উচ্চ স্তর ৪ বছর।

প্রাথমিক স্তর ঃ

(২) আপাততঃ শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তরের জন্য একটা পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

(৩) এই বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের বয়স ৬ থেকে ৮ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

বিঃ দ্রঃ-মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলোতে যারা ভর্তি হবে তাদেরকে পরীক্ষামূলকভাবে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (উর্ধপক্ষে তিন মাস) বিশেষ শ্রেণীতে (Special class) রাখা যেতে পারে। একজন সমবয়সী ছাত্রকে তার সহযোগী নিয়োগ করা হবে। সহযোগী তাকে শিক্ষা কেন্দ্রের পরিবেশ ও বিভিন্ন বিভাগের সাথে পরিচিত করাবে। এই সহযোগীকে যিনি তদারক করবেন তিনি ঐ নবাগত ছাত্রকেও তদারক করবেন এবং চেষ্টা করবেন যাতে সে যত শীঘ্র সম্ভব একটা শ্রেণীতে শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা কেন্দ্রের পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার যোগ্য হয়।

(৪) এ বিদ্যালয় অবশ্যই আবাসিক হতে হবে।

(৫) ছাত্রদের শিক্ষা ও আবাসিক ব্যয় তাদের অভিভাবকরাই বহন করবেন।

(৬) এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র সেইসব লোকের সন্তানদের ভর্তি করা হবে যারা ইসলামী জীবন দর্শন, জীবন-লক্ষ্য ও ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক। ভর্তির সময় অভিভাবকদের নিকট থেকে এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকার নিতে হবে যে,

তারা তাদের সন্তানদেরকে কোন ধরনের অ-ইসলামী ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সদস্য বানাবেন না বরং ইসলামের সেবার জন্যই তারা সন্তানদেরকে ওয়াকফ করেছে।

(৭) প্রাথমিক স্তরে ছাত্রদেরকে কোন পেশার জন্য তৈরী করার প্রশ্ন ওঠে না। তথাপি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাস্তব ও নৈতিক প্রশিক্ষণ দ্বারা ছাত্রদের সমস্ত জন্মগত যোগ্যতা ও প্রতিভার এতটা উৎকর্ষতা ও বিকাশ সাধনের চেষ্টা করবেন এবং তাদেরকে এতটা বাস্তব ও পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়ে দেবেন যে, আট বছরের শিক্ষা শেষ করে তারা যেন নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি সাহস ও মনোবল অর্জন করতে পারে। এর ফলে তারা অনুভব করবে যে, আল্লাহর এ পৃথিবীতে তাদের জন্য সর্বত্র কাজ করার এবং জীবিকা উপার্জনের সকল সুযোগ বর্তমান। তারা সে সুযোগ গ্রহণে নিজেদেরকে সক্ষমও মনে করবে। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সমাপ্তকারী ছাত্রদের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য এই একটি মাত্র সমাধানই আপাতত আছে।

মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা

(১) এ পর্যায়ের শিক্ষার জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করতে হবে।

(২) এর শিক্ষাকাল হবে ৬ বছর। ২ বছর মাধ্যমিক এবং ৪ বছর উচচ স্তরের জন্য।

বিঃ দ্রঃ-আরবী মাদ্‌রাসাসমূহের শিক্ষা সমাপনকারী এবং বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছাত্রদের জন্য এর চেয়েও কম সময়ে উচ্চস্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করার সুযোগ করে দিতে হবে।

(৩) মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে মেট্রিক (যা বর্তমানে এস. এস. সি.) অথবা মাদ্‌রাসা শিক্ষার মাধ্যমিক মান সম্পন্ন হতে হবে।

(৪) ভর্তি পরীক্ষা বিশেষ করে মৌখিক পরীক্ষা সাপেক্ষে ভর্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৫) শুধুমাত্র ইসলামী আন্দোলনে শরীক হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকেই এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে হবে।

(৬) সমস্ত ব্যয়ভার ছাত্রদের নিজেদেরই বহন করত হবে।

(৭) বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর পাঠদান ও সব রকমের ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষজ্ঞদের কমিটি থাকবে। এই কমিটি বিস্তারিত খুঁটিনাটি ঠিক করবে।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ও তার বাস্তবায়ন

(লাহোরে বরকত আলী মোহামেডান হলে ছাত্রদের এক সমাবেশে ১৯৫২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী প্রদত্ত ভাষণ। ভাষণের অংশ বিশেষ অনিবার্য কারণে সামান্য রদবদল করে অনুবাদ করা হলো- অনুবাদক)

দেশে কি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়া উচিত সে প্রশ্ন একটা মুসলিম দেশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবাস্তব। এটা অবিসংবাদিত ব্যাপার যে, একটা মুসলিম দেশে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাই চালু হওয়া উচিত। তবে কিভাবে ও কি পন্থায় ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা যায় বা কি পদ্ধতিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামী রূপ দেয়া যায়, কেবলমাত্র সেই বিষয় নিয়েই চিন্তাভাবনা করা দরকার।

এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো বুঝতে হবে। বর্তমানে দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে তার দোষ-ত্রুটি না জানা পর্যন্ত কিভাবে তার সংস্কার ও সংশোধন করা যেতে পারে, সেটা জানা সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে বর্তমানে দু'ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। একটা শিক্ষা-ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের প্রচীন পদ্ধতির মাদ্রাসাগুলোতে। সে শিক্ষা আমাদের ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য আলেম তৈরী করে। আর দ্বিতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চালু রয়েছে, এটা ধর্মীয় পরিমন্ডলের বাইরে গোটা দেশ ও সমাজ পরিচালনার জন্য কর্মী তৈরী করে। আমি এই উভয় শিক্ষাব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি বিশ্লেষণ করতে চাই।

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ঃ

আমাদের দেশে প্রচলিত প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা আজ থেকে কয়েক শতাব্দী আগে প্রবর্তিত হয়। যখন এখানে বৃটিশ সরকার আসে এবং একটি রাজনৈতিক বিপ্লবের পর আমরা তাদের গোলামে পরিণত হই। তখন যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের চালু ছিল সেটা আমাদের তৎকালীন প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট ছিল। সেই শিক্ষাব্যবস্থায় তৎকালীন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দরকারী সকল বিষয় পড়ানো হতো। এতে শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই ছিল না, বরং দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ও ছিল। সে সময়কার সিভিল সার্ভিসের জন্য যে ধরনের বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল তা সবই পড়ানো হতো। কিন্তু যখন একটি রাজনৈতিক বিপ্লবের কারণে আমরা গোলামে পরিণত হলাম তখন সেই গোটা

শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেল। সেই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত লোকদের জন্য নতুন যুগের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কোন স্থানই থাকলো না। নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য যে ধরনের বিদ্যা জানার দরকার ছিল, তা ঐ শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আর ঐ শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব বিদ্যা অন্তর্ভুক্ত ছিল, এই নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থায় সে সব বিদ্যা জানার কোন প্রয়োজন লোকদের ছিল না। তা সত্ত্বেও যেহেতু আমাদের শত শত বছরের জাতীয় উত্তরাধিকার ঐ শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আমাদের ধর্মীয় চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর মত কিছু উপকরণও তাতে ছিল (যদিও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না) তাই তৎকালে আমাদের জাতির একটা বিরাট অংশ অনুভব করল যে, ঐ শিক্ষাব্যবস্থাকে যে করেই হোক বহাল রাখতে হবে, যাতে আমরা পৈত্রিক উত্তরাধীকারের সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন না হয়ে যাই।

এ উদ্দেশ্যেই তারা ওটাকে হুবহু রাখলো। কিন্তু ক্রমান্বয়ে অবস্থার যতই পরিবর্তন ঘটতে লাগলো ততই তার কার্যকারিতা কমতে লাগলো। কেননা ঐ শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে যারা শিক্ষা লাভ করে বের হলো সমকালীন জীবন ধারা ও তার সমস্যাবলীর সাথে তাদের কোন সংশ্রব থাকলো না। আজ যারা ঐ শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে লেখাপড়া করে বের হচ্ছে তাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মসজিদে ইমামতি, মাদ্রাসার শিক্ষকতা এবং জনগণকে নিজেদের প্রয়োজন উপলব্ধি করানোর জন্য নিত্য নতুন ধর্মীয় বিতর্ক তোলা। তাদের দ্বারা কিছু না কিছু উপকার আমাদের নিশ্চয়ই হয়ে থাকে। তাদের চেষ্টাতেই কুরআন ও ধর্ম সংক্রান্ত কিছু না কিছু জ্ঞান সমাজে বিস্তার লাভ করে। কিছুটা ধর্মীয় জ্ঞান ও সচেতনতা সমাজে বহাল থাকে। কিন্তু এটুকু উপকারের বিনিময়ে মুসলিম সমাজের যে ক্ষতি তাদের ধর্মীয় বিতর্কের কারণে হচেছ, সেটা কোন অংশে কম নয়। তারা যেমন ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, তেমনি বর্তমান জীবন সমস্যার উপর ইসলামের মূলনীতিগুলো প্রয়োগ করতেও সক্ষম নন। এখন তাদের মধ্যে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতাও নেই, আবার আমাদের জাতীয় সমস্যাবলীর কোন সমাধানও তারা দিতে সক্ষম নন। মোটের ওপর একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, তাদের কারণে ইসলামের সম্মান আদৌ বাড়ছেনা, বরং আরো কমছে। তাদের দ্বারা ইসলামের যে ধরনের প্রতিনিধিত্ব হচেছ তার কারণে আমরা জনগণকে ক্রমান্বয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে দেখছি এবং ইসলামের মর্যাদাও দিন দিন ক্ষুণ্ন হয়ে চলেছে। তাদের কারণে

ধর্মীয় বিতর্কের এক নিরবিচ্ছিন্ন ধারা চালু হয়েছে। এ ধারার যেন আর শেষ নেই। কারণ জীবন জীবিকার প্রয়োজন তাদেরকে এসব বিতর্ক চালু রাখতে ও ক্রমে বাড়িয়ে তুলতে বাধ্য করে থাকে। এসব বিতর্ক যদি না থাকে তবে জাতি তাদের প্রয়োজনই অনুভব করবে না।

এই হলো আমাদের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার হাল হাকিকত। আর স্পষ্ট করে বলতে গেলে আমি বলবো এটা পুরোপুরি ধর্মীয় শিক্ষা নয়। প্রকৃত পক্ষে এটা আজ থেকে প্রায় দুই আড়াইশো বছর আগেরকার সিভিল সার্ভিসের কোর্স হিসেবে চালু করা হয়েছিল। সে সময় ইসলামী ফিকহই ছিল দেশের কার্যকরী আইন এবং তার নির্বাহীদের জন্য ইসলামী ফিকাহ ও তার উৎসসমূহ জানা ছিল অপরিহার্য। প্রধানত এ কারণেই এর সাথে এগুলো জুড়ে দেয়া হয়েছিল। আজ আমরা ওটাকে ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবে মেনে নিয়ে তৃপ্তি বোধ করছি। কিন্তু এতে ধর্মীয় শিক্ষার উপাদান নিতান্তই কম। কোন আরবি মাদ্‌রাসাই এমন নেই যার পাঠ্যসূচীতে পুরো কুরআন মজীদ অন্তর্ভুক্ত আছে। এতে শুধু কয়েকটি সূরা মাত্র পড়ানো হয়। কোথাও পাঠ্যসূচীতে গোটা কুরআন মজীদ থাকলে শুধু তার অনুবাদই পড়ানো হয়। গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে কুরআন মজীদ পড়ানোর পাঠ্যসূচী কোন মাদরাসাতেই নেই। হাদীসের অবস্থাও তথৈবচ। এরও যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা-যা কিনা মুহাদ্দিস হবার জন্য প্রয়োজন-কোথাও চালু নেই। হাদীস শিক্ষার যে পদ্ধতি আমাদের এ সব মাদ্রাসায় চালু আছে তা হলো ফিকাহ কিংবা আকীদার সাথে সম্পৃক্ত কোন হাদীস পাওয়া গেলে তা নিয়ে এক নাগাড়ে দুই তিন দিন ধরে বক্তৃতা দেয়া হয়। কিন্তু যেসব হাদীস থেকে দ্বীনের তাৎপর্য বুঝা যায় অথবা যেসব হাদীসে ইসলামের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা নৈতিক বিধান বর্ণীত হয়েছে, যাতে শাসনতান্ত্রিক বিষয়, বিচার ব্যবস্থা কিংবা আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে আলোকপাত করে, সেসব হাদীস এমন ভাবে পড়ানো হয় যেন তাতে প্রয়োজনীয় কোন কথাই নেই। তারা এত দ্রুততার সাথে ঐ সব হাদীস অতিক্রম করে যান যে তাতে মনোযোগ দেয়ার মত কিছু আছে বলেই যেন তারা মনে করেন না। হাদীস ও কুরআনের তুলনায় ফিকাহ শাস্ত্রের দিকেই তাদের নজর বেশী। তাও বেশীর ভাগ, বরং বলতে গেলে পুরোপুরিই ফিকাহ শাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকেন। ফিকাহর ইতিহাস, তার ক্রমবিকাশ, তার বিভিন্ন মাযহাবের মৌল বৈশিষ্ট্য, এসব মাযহাবের সর্বসম্মত ও বিরোধীয় মূলনীতিসমূহ, মূলনীতির আলোকে প্রয়োজনীয় বিধি রচনায় মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসৃত নীতিমালা

ইত্যাদি যা না জানলে সত্যিকার ফকীহ্ হওয়াই যায় না, এসব বিষয় মাদ্‌রাসার শিক্ষায় আদৌ বর্তমান নেই। ছাত্র তো দূরের কথা শিক্ষকরাও এসব বিষয় ওয়াকিফহাল নন।

সুতরাং যে ধর্মীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য এই শিক্ষাব্যবস্থা বহাল রাখা হয়েছিল, সে লক্ষ্য অর্জনেও তা যথেষ্ট নয়। আর পার্থিব প্রয়োজনের তো কথাই ওঠে না। কারণ তার সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ঃ

এর পর বিবেচনা করা যাক বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার কথা। দুনিয়ায় যে শিক্ষাব্যবস্থাই চালু করা হোক, তার শুরুতেই এই মৌলিক প্রশ্নটি বিবেচনা করতে হয় যে, কি ধরনের মানুষ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এবং কোন মাপকাঠি অনুসারে মানুষ তৈরী করার উদ্দেশ্যে শিক্ষাব্যবস্থাটি প্রবর্তিত হতে যাচেছ। এই মৌলিক প্রশ্নের আলোকে যদি বিচার-বিবেচনা করা হয় তাহলে পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, মনুষ্যত্বের যে মাপকাঠি মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য ও গ্রহণযোগ্য বৃটিশ সে মাপকাঠিতে বিশ্বাসী ছিল না। মুসলমানদের কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার ও তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য কর্মী তৈরী করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ এ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে নি এবং তা করতেও পারে না। এমনকি তাদের মনুষ্যত্বের যে মাপকাঠিতে তারা বিশ্বাসী, সেটাও এখানে তাদের অভিপ্রেত ছিল না।

তারা নিজ দেশে নিজ জাতির জন্য যে উদ্দেশ্যে মানুষ তৈরী করে থাকে এখানে তারা সে উদ্দেশ্যে মানুষ গড়তে ইচছুক ছিল না। একটা স্বাধীন দেশ চালানোর উপযোগী লোক তারা এখানে তৈরীই করতে চায় নি। সে ধরনের লোক তারা তাদের নিজ দেশেই কামনা করতো এ দেশে নয়। এদেশে তারা এমন লোক প্রত্যাশা করতো যারা একটি বিদেশী শাসকগোষ্ঠিকে সরকার চালাতে সাহায্য করতে পারে, যারা তাদের ভাষা জানে, যাদের সাথে তারা যোগাযোগ করতে পারে ও যেমন খুশী কাজ করতে পারে। তাদের দেশ শাসনের নীতি জানে ও বুঝে এবং তাদের উপযোগী হতে পারে, এমন লোকই তাদের প্রয়োজন ছিল। বস্তুত এটাই তাদের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়। এ জন্যই তারা এখানে এ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল।

খোদাহীন শিক্ষা ঃ

এ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তারা যত জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখিয়েছে তার মধ্যে ইসলামের নাম গন্ধও ছিল না এবং থাকার কথাও নয়। খোদ ইউরোপে ঐ সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ যাদের হাতে হয়েছে তারা ছিল খোদাবিমুখ। সেখানকার ধর্মীয় গোষ্ঠীকে আগেই চিন্তা ও কার্যক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত ও বিতাড়িত করা হয়েছিল। এ জন্য কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি ইতিহাস, কি সমাজবিজ্ঞান সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানই এমন লোকদের হাতে রচিত ও বিকশিত হয়েছে যারা পুরোপুরি নাস্তিক না হলেও অন্তত পার্থিব জীবনে তারা আল্লাহর আনুগত্যের কোন প্রয়োজন অনুভব করত না। বৃটিশ শাসকরা তাদের সেইসব জ্ঞান বিজ্ঞান তাদের প্রণীত বই পুস্তকসহ আমাদের এ দেশে চালু করে এবং আজ পর্যন্ত এখানে ঐসব জিনিসই তাদের অনুসৃত পদ্ধতিতে পড়ানো হচেছ। এ শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে যারা শিক্ষা লাভ করেছেন তাদের মন-মগজ আপনা আপনি ইসলাম থেকে, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এবং ইসলামী নৈতিকতা ও চিন্তাধারা থেকে ক্রমেই দূরে সরে গিয়েছে। এতে তাদের কোন অপরাধও নেই এবং তাদের ইচছা অনিচছারও কোন হাত ছিল না। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে ব্যক্তি তার শিক্ষার সূচনা বিন্দু থেকে সর্বোচচ স্তর পর্যন্ত পৃথিবী সম্পর্কে যত জ্ঞান লাভ করলো কোনটাই খোদার আনুগত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে শিখলো না, তার মন-মগজে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস কিভাবে শিকড় গজাতে পারে? তার পাঠ্যপুস্তকে কোথাও আল্লাহর উল্লেখ নেই। তার ইতিহাস পুস্তকে সমগ্র জীবনকালব্যাপী মানুষকে নিজের ভাগ্য নিজেই ভাঙতে ও গড়তে দেখলো, তার দর্শন শিক্ষায় স্রষ্টাকে বাদ দিয়েই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করা হলো। তার বিজ্ঞান শিক্ষায় সমগ্র বিশ্ব কারখানাকে কোন প্রাজ্ঞ নির্মাতা এবং কুশলী ব্যবস্থাপক ও পরিচালক ছাড়াই পরিচালিত বলে দেখানো হলো। আর আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিদ্যার পাঠ্যক্রমে মানুষের স্রষ্টা তার জন্য কি আইন বিধান দেন সে সম্পর্কে আদৌ কোন কথাই শেখানো হলো না। বরং তার সমস্ত বিদ্যার মূল কথা দাঁড়ালো এই যে, মানুষ নিজেই নিজের জীবন ব্যবস্থা রচনা করার অধিকারী। এ ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কখনো বলার দরকার হয় না যে, তুমি আল্লাহকে অমান্য কর। সে আপনা আপনিই আল্লাহ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে যাবে। আল্লাহকে নিয়ে তার মনে কোন রকম ভাবনা চিন্তার সৃষ্টি হবে না এটাই স্বাভাবিক।

নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ঃ

এ শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যের ধারণা এবং ইসলামী নৈতিকতার সৃষ্টি তো হয়ই না, উপরন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে, এ শিক্ষা তরুণ সমাজের মধ্যে মৌলিক মানবীয় চরিত্র পর্যন্ত তৈরী করে না। অথচ এই মৌলিক মানবীয় চরিত্র ছাড়া কোন জাতি দুনিয়ায় উন্নতি করা তো দূরের কথা, বেঁচে থাকতেও পারে না। এ শিক্ষা নিয়ে যে বংশধর গড়ে উঠেছে, তারা পাশ্চাত্য জাতিগুলোর যাবতীয় খারাপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পুরোপুরিভাবে সজ্জিত হচেছ। কিন্তু তাদের উত্তম গুণাবলীর ছিঁটেফোটাও তাদের গায়ে লাগছে না। তাদের মধ্যে দায়িত্ব জ্ঞান, সার্বক্ষণিক সতর্কতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, দৃঢ়তা, ধৈর্য ও দৃঢ়সংকল্প, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, আত্মসংযম, উচচতর ব্যক্তিত্ব বা আদর্শের আনুগত্য ইত্যাকার গুণ সৃষ্টি হয় না। তারা একেবারেই ভুঁইফোড় উদ্ভিদের মত। দেখে মনেই হয় না যে তাদের কোন জাতীয় চরিত্র আছে। যত মর্যাদাপূর্ণ পদেই তারা আসীন থাক, হীন থেকে হীনতর ও নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর দুর্নীতি ও দুষ্কর্মে লিপ্ত হতে তারা কিছু মাত্র সংকোচ বোধ করে না। তাদের মধ্যে জঘন্যতম ঘুষখোর, স্বজনপ্রীতি, সুপারিশকারী ও সুপারিশ পূরণকারী, চোরাকারবারী, অবৈধ চোরা চালানী, ন্যায়নীতি–আইনকানুন ও নিয়মনীতি লংঘনকারী, কর্তব্য অবহেলা ও ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, মানুষের হক নষ্টকারী এবং নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থে সমগ্র জাতির স্বার্থ ও কল্যাণের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাতকারী লোক একজন দু'জন নয় জীবনের প্রতিটি বিভাগ ও অংগনে রয়েছে। তারা সর্বক্ষেত্রে খুব তৎপর। বৃটিশ শাসকরা বিদায় নেয়ার পর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত লোকেরাই আগলে রেখেছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই চরিত্র বিবর্জিত লোকদের হাতে দেশের যে কি দশা হয়েছে তা আজ সবাই দেখতে পাচেছন। যে নব বংশধর আজ এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করছে তাদের স্বভাব–চরিত্র ও আচার–আচরণের অবস্থা যদি জানতে চান তবে যে কোন সময় হোটেলে, প্রমোদ কেন্দ্রে ও জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠানাদির সময়, অলিতে গলিতে প্রকাশ্যেই দেখতে পারেন।

প্রশ্ন জাগে যে, এ শিক্ষায় আল্লাহর আনুগত্য ও ইসলামী চরিত্র তৈরী না হোক কিন্তু যে চরিত্র বৃটিশ, জার্মান, আমেরিকান ও অন্যান্য উন্নত পার্শ্চাত্য জাতিগুলোর মধ্যে রয়েছে ততটুকু চরিত্রও কেন গড়ে উঠে না? তাদের মধ্যে মৌলিক মানবীয় চরিত্রটা অবশ্যই পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায়। অথচ আমাদের এখানে তা-ও নেই। তাহলে এর কারণটা কি?

আমার মতে এর কারণ হলো, মৌলিক মানবীয় চরিত্র গঠন করার পরিকল্পনা একমাত্র এমন এক শিক্ষাব্যবস্থাই করতে পারে যে শিক্ষাব্যবস্থা কোন স্বাধীন জাতি নিজেদের সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রবর্তন করে। একটা স্বাধীন জাতিকে আপন সভ্যতা সংস্কৃতির স্থায়িত্ব ও বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত দৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য চরিত্রের কর্মী তৈরী করার কথা অবশ্যই ভাবতে হয়। বৃটিশ জাতির এরূপ চরিত্রের লোকের প্রয়োজন ছিল তাদের নিজ দেশে, এদেশে নয়। এ দেশে বরং ইংল্যান্ডের সম্পূর্ণ বিপরীত গোলামীর মন-মানসিকতাই তৈরী করা তাদের অভিপ্রেত ছিল। এখানে তারা চেয়েছিল গোলামসুলভ চরিত্র সৃষ্টি করতে, এমন চরিত্রের লোক সৃষ্টি করতে যারা নিজেদের হাতে নিজেদের দেশ জয় করে তা আপন জাতির শত্রুদের হাতে সমর্পন করতে পারে এবং তার পরে নিজেদের দেশের প্রশাসন নিজেদের কল্যাণার্থে নয়; অন্যদের সুবিধার্থে চালাতে পারে। এ কাজের জন্য যে ধরনের চরিত্র দরকার বৃটিশ শাসকরা ঠিক সেই ধরনের চরিত্রই এখানে গঠন করতে চেয়েছিল এবং সেই চরিত্র গঠনের জন্যই তারা এখানকার শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিল। তাদের প্রণীত সেই শিক্ষানীতিই আজ পর্যন্ত হুবহু চলে আসছে। এ শিক্ষানীতি দ্বারা কেউ যদি একটা স্বাধীন দেশের উপযোগী দৃঢ় চরিত্রের লোক তৈরী হওয়ার আশা করে থাকে তবে প্রথমে তার নিজের বিবেক-বুদ্ধি ঠিক আছে কিনা ভেবে দেখা দরকার।

আধুনিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার লেজুড় ঃ

উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর যখন এই শিক্ষাব্যবস্থা এখানে চালু হলো এবং সেই সাথে এ শিক্ষা যারা গ্রহণ করবে না তাদের জন্য উন্নতি ও সুখ-সমৃদ্ধির সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেল, তখন আমাদের সমাজের চিন্তাশীল জ্ঞানী লোকেরা এই ভেবে শংকিত হয়ে উঠলেন যেন আমাদের নবীন বংশধরদেরকে এই শিক্ষাব্যবস্থা হয়তো একেবারেই অমুসলমান বানিয়ে ছাড়বে। এ জন্য তারা এই শিক্ষাব্যবস্থার অধীনেই নিজস্ব উদ্যোগে মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করলেন। পরিকল্পনা নেয়া হলো, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যা পড়ানো হয় এসব প্রতিষ্ঠানেও তাই পড়ানো হবে। ইংরেজরা তাদেরকে যে কাজের জন্য তৈরী করতে চায় সে উদ্দেশ্যেই তাদেরকে ট্রেনিং ইত্যাদি দেয়া হবে। তবে এর সাথে কিছু ধর্মীয় শিক্ষাও যুক্ত হবে যেন ছাত্ররা একেবারেই কাফের হয়ে না যায়। এটা ছিল একটা সংস্কারমূলক পরিকল্পনা। মনে করা হচ্ছিল

যে, এভাবে এইসব প্রতিষ্ঠানে যেসব মুসলিম তরুণরা পড়তে আসবে তাদেরকে ইংরেজী শিক্ষার সম্ভাব্য কুফল থেকে কিছুটা রক্ষা করা সম্ভব হবে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হলো এবং বিচার-বিবেচনা করলেও বুঝা যায়, এ ধরনের কলম লাগানোর চেষ্টা (গাছের ক্ষেত্রে সফল হলেও মানুষের ক্ষেত্রে) সফল হওয়ার নয়। জোড়াতালি দিয়ে মানুষ গড়ার এ উদ্ভট চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য স্বাভাবিক নিয়মেই এ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কথা।

এদিকে একজন ছাত্রকে যাবতীয় দুনিয়াদারী জ্ঞান-বিজ্ঞান এমনভাবে শেখানো হচেছ যে, সে গোটা প্রকৃতির কারখানা খোদা ছাড়াই তৈরী করেছে এবং খোদা ছাড়াই সফলভাবে চলছে বলে অনুভব করে । যে জ্ঞান সে লাভ করে তার কোথাও সে অনুভব করতে পারে না যে, এই বিশাল দুনিয়া ও তার বিরাট কর্মক্ষেত্রের কোথাও আল্লাহর রসূল ও অহীর কোন স্থান বা প্রয়োজন থাকতে পারে। সব রকমের জীবন ব্যবস্থাকে সে এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখতে শেখে। এরপর হঠাৎ তাকে ধর্মীয় শিক্ষার শ্রেণীতে নিয়ে বলা হয় যে, আল্লাহও আছেন, রাসূলও আছেন এবং অহীও আসে আর কিতাবও নাযিল হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন ভেবে দেখুন, বিশ্বজগৎ ও জীবন সম্পর্কে তার যে সামগ্রিক ধারণাটা জন্মেছে, তা থেকে তাকে আলাদা ও সম্পূর্ণ বিচিছন্ন করে স্বতন্ত্র এই জ্ঞানটা যে তাকে দেয়া হলো, একে সে অর্জিত সামগ্রিক জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের সাথে কিভাবে খাপ-খাওয়াবে এবং এটাকে সে কোথায় রাখবে? জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাকে তো খোদাহীন জ্ঞান দেয়া আছেই এবং দেয়া চলছেও। তার সাথে আলাদা করে ধর্মীয় শিক্ষার একটা পুটলিও দিয়ে দেয়া হলো। এখন এ পুটলি খুলে সে রোজ রোজ অন্যান্য জ্ঞানের সাথে এই ধর্মীয় জ্ঞান একটু একটু করে মিকচার করতে থাকবে এবং তাতে আপনা থেকেই তার মনে একটা ভিন্নতর ধারণা বিশ্বাস অর্থাৎ খোদায়ী ব্যবস্থাপনার ধারণা গজিয়ে উঠবে। এটা কি আশা করা যেতে পারে?

এর চেয়েও পরিতাপের ব্যাপার এই যে, মুসলিম জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপন করা হয়েছে তাতেও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মতই ধর্মহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। ছাত্র ইংরেজীতে কথা বলুক ও ইংরেজী পোষাক পরিধান করুক এ চেষ্টাতো করা হয়েছেই। এমনকি ইংরেজদের কৃষ্টি, তাদের চাল-চলন ও আচরণ সম্পূর্ণরূপেই ছাত্রদেরকে রপ্ত করানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। খেলাধূলায়, উঠাবসায়, চাল-চলনে, বিতর্ক বক্তৃতায় মোট কথা সব কিছুতেই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোন অংশেই সরকারী শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে পিছিয়ে না থাকে তার চেষ্টা করা হয়েছে। অবিকল সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমমানের লোক এসব প্রতিষ্ঠান থেকেও বের হোক এবং কেউ যেন বলতে না পারে যে, ইংরেজী মানদন্ডের বিচারে এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া ছাত্ররা সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া ছাত্রদের চেয়ে নিম্ন মানের। এ জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মুসলিম জাতির শিক্ষা ব্যবস্থার কর্ণধারদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই যখন এই এবং এর খাতিরে সম্পূর্ণ ফিরিঙ্গীপনার পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা যখন করা হয়েছে তখন এ ধরনের পরিবেশে ইসলামের ঐ কলম লাগানো পরগাছা চারাটা কি উপকার দর্শাতে পারে? একে তো শিক্ষাগত দিক থেকে ওটা ছিল নিতান্তই দুর্বল। অন্য কোন পাঠ্যসূচীর সাথে তার কোন সংশ্রব ও সামঞ্জস্য ছিল না। যতগুলো যুক্তি প্রমাণ আল্লাহর আনুগত্য সৃষ্টির সহায়ক হতো তা সবই খোদাহীনতা ও খোদা বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকন্তু বেসরকারী কলেজগুলোতেও সরকারী কলেজগুলোর অনুরূপ জীবন যাপনের পরিবেশ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ গোটা ব্যবস্থা এমন করে তৈরী করা হয়েছে যে, তা ইসলামের দুর্বল জোড়াতালির সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে ফিরিঙ্গীপনা ও নাস্তিকতারই উপযোগী ও অনুকূল হয়েছে। এই জোড়াতালিকে শক্তিশালী করার মত কোন একটা উপকরণও সেখানে ছিল না। বরং সব কিছুই তার প্রকৃতির বিরোধী ছিল। এতসব প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেও আমাদের শিক্ষা কর্ণধাররা অলৌকিকভাবে ধর্মীয় জাগরণ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি, ইসলামী মূল্যবোধের উদ্ভব ও ইসলামী প্রেরণার বিকাশ এবং ইসলামী চরিত্র গঠনের আশায় বিভোর ছিলেন। অথচ প্রাকৃতিক বিধান মতে এর যে অনিবার্য ফল দেখা দেয়ার কথা ছিল এবং বাস্তবে দেখা দিয়েছে, তা হলো, যেসব ছাত্রকে এই প্রণালীতে ইসলামী শিক্ষা দেয়া হয়েছে তাদের দৃষ্টিতে ইসলামের গুরুত্ব ও মর্যাদা আরো কমে গিয়েছে, তাদের ধর্মীয় অবস্থা মিশনারী কলেজ ও সরকারী কলেজের ছাত্রদের চেয়েও খারাপ হয়ে গিয়েছে। এটা তো বাস্তব সত্য যে, আজকাল কলেজগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার ঘন্টাটা সাধারণভাবে আমোদ-প্রমোদ ও তামাসা উপহাসের ঘন্টা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এর দ্বারা অন্তরে ঈমানী তেজ সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে যেটুকু ঈমান ছিল তাও নিঃশেষ করার মত খেদমত হচেছ। নিজেরাই যখন তাদের সামনে ইসলামকে অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের চেয়ে নগণ্য করে পেশ করছি তখন আল্লাহর তরফ থেকে কমপক্ষে এতটুকু শাস্তি না হয়ে পারে না যে, আমাদের ছেলেরা আমাদের চোখের সামনেই নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী হয়ে আবির্ভূত হবে এবং যেসব

শিক্ষক খোদা, রাসূল ও আখেরাতে বিশ্বাসী তাদেরকে বেওকুফ ও নির্বোধ মনে করবে।

সংস্কার সাধনের ক্রটিপূর্ণ ব্যবস্থা ঃ

আজ থেকে ১৭-১৮ বছর আগে (বক্তৃতা কাল ১৯৫২) এই কুফল অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। আমার মনে পড়ে, ১৯৩৪ থেকে ৩৫ সালে একবার হঠাৎ চাঞ্চল্যকর একটি প্রশ্ন উঠল যে, আমাদের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে এত অধিক পরিমাণে ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক্যবাদের প্রচারক বের হচ্ছে কেন? বিশেষ করে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এ প্রশ্ন ছিল আরো তীব্র। সাধারণ ধারণা মোতাবেক সেখানে শতকরা নব্বই জন ছাত্র খোদাদ্রোহিতা ও নাস্তিকতায় বিশ্বাসী ছিল। বিষয়টি যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং সারা দেশে এ সম্পর্কে লেখালেখি শুরু হল, তখন একটা কমিটি গঠন করা হলো, ঐ কমিটি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করল। অবশেষে ধারণা করা হলো যে, ইসলামী শিক্ষার পরিমাণ আর একটু বাড়িয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ঐ কমিটি কিছু সংশোধনী প্রস্তাব দিল এবং একটা নতুন পাঠক্রম প্রণয়ন করা হলো। কিন্তু সে সংশোধন কিছু মাত্র লাভজনক হলো না। ফলে আজও অবস্থা অপরিবর্তীত রয়ে গিয়েছে।

আমি তখনই অনুমান করেছিলাম এবং মাসিক তরজমানুল কুরআনে লিখেও ছিলাম যে, এসব পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হবে না। আজ আমি এ প্রসঙ্গ আবারও তুলছি এজন্য যে, আমাদের যেসব কর্তা ব্যক্তিদের হাতে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করার ক্ষমতা তারা যথাসাধ্য আমাদেরকে ইসলামী শিক্ষা কায়েমের সুসংবাদ শুনিয়ে থাকেন। অথচ তারা পুনরায় একই ভুল করতে চলেছেন। তারাও বৃটিশ আমল থেকে চালু থাকা শিক্ষাব্যবস্থাকে হুবহু বহাল রেখে তার আওতাধীন ইসলামী শিক্ষার আনুপাতিক পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিতে চান। তাদের চিন্তা ভাবনায় এর চেয়ে বেশী কিছু নেই। এ জন্য যে কথা আমি তখন বলেছিলাম আজ আবার তার পুণরাবৃত্তি করছি।

আমার মতে একটা শিক্ষাব্যবস্থায় পরস্পর বিরোধী দু'টি উপাদান অন্তর্ভুক্ত করার চেয়ে মারাত্মক ভুল কাজ আর কিছু হতে পারে না। আর তাও এমন দু'টো উপাদান যা পরস্পর সাংঘর্ষিক এবং একটি আরেকটির নাসিকায় ঘুষি বর্ষণকারী। এ ধরনের মিশ্রন শিক্ষার্থীর মন মগজকে নষ্ট করা ছাড়া আর কোন ফল দর্শাতে পারে না।

ধরে নেয়া যাক, এই ভেজাল এমনভাবে করা হলো যে এতে ইসলামী শিক্ষার উপকরণ শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হলো। বাকী ৫০ ভাগ ইংরেজরা যেভাবে তৈরী করে গিয়েছে ঠিক তেমনি থাকল। তাহলেও এর অনিবার্য ফল দাঁড়াবে এই যে, প্রত্যেক ছাত্রের মন-মগজ এক একটি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হবে। শুধুমাত্র মন-মগজ কেন, তাদের গোটা জীবনই হয়ে দাঁড়াবে রণক্ষেত্র। আর এই ইসলামী পুঁথিগত শিক্ষার পরিমাণ ৫০ ভাগ করে দেয়ার পরও শিক্ষার পরিবেশ এবং শিক্ষাঙ্গনের গোটা জীবনধারা যদি ইংরেজদের আমলের মত ফিরিঙ্গী ধাঁচেরই থেকে যায় এবং দেশের শাসন ব্যবস্থাও ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপরই যথারীতি বহাল থাকে তাহলে এর অনিবার্য পরিণতি দাঁড়াবে এই যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তিন ধরনের লোক তৈরী হবে। প্রথম শ্রেণী হবে ইসলামী শিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও নাস্তিক ও ইসলাম বিরোধী। কেননা শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলাম বিরোধী যে অংশটি রয়েছে, তার পৃষ্ঠপোষকতায় থাকবে কলেজের সামগ্রিক পরিবেশ। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক আনুকূল্য এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের সৃষ্ট আন্তর্জাতিক পরিবেশ হবে তাদের পুরো অনুকূলে। দ্বিতীয় শ্রেণীটা হবে ইসলামী শিক্ষার প্রভাবাধীন। তারা ইসলাম প্রিয় ও ধর্মপরায়ণ হবে। আর তৃতীয় গোষ্ঠী হবে আংশিক মুসলমান ও আংশিক অমুসলমান। ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে তারা দ্বিধান্বিত হয়ে ঝুলতে থাকবে।

ভেজাল মিশ্রিত ব্যবস্থার এ পরিণতি অনিবার্য। পরীক্ষা করলেই দেখতে পারেন যে, জাতির মধ্যে সত্য সত্যই ঐ তিন রকমের লোক তৈরী হয়ে যাচেছ। এরা কোন সংস্কৃতি-সভ্যতা এবং কোন জীবন-ব্যবস্থার বিকাশ ও লালনে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা করতে পারবে না। এখন জিজ্ঞাস্য হলো ঃ এ রকম বহুবিধ মানসিকতার লোক লালন-পালনের একটা গারদ তৈরীর জন্যই কি একটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা রচনা করা হয়ে থাকে?

বৈপ্লবিক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা ঃ

আমাদের সত্যিই যদি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করার ইচছা থেকে থাকে তাহলে কেবল জোড়াতালি ও মেরামত দ্বারা কার্যসিদ্ধি হবে না, বরং সে জন্য একটা বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই কথাটা উপলব্ধি করানোর জন্যেই আমাদের এ আলোচনার অবতারণা। আসলে প্রচলিত দু'টো শিক্ষাকেই অর্থাৎ পুরনো ধর্মীয় শিক্ষা এবং বৃটিশ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষাকে বাতিল করে দেয়া এখন

অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই উভয় ব্যবস্থার পরিবর্তে একটা নতুন একক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। প্রচলিত দুটো শিক্ষাব্যবস্থার যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে নতুন শিক্ষাব্যবস্থাকে মুক্ত হতে হবে এবং একটা মুসলিম স্বাধীন ও উন্নয়নকামী জাতি হিসেবে আমাদের যাবতীয় চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা তার আওতাভুক্ত থাকতে হবে। এই নয়া শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো ও তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ ঃ

এই নয়া শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রণয়নে সর্বপ্রথম যে জিনিসটা আমাদের ফয়সালা করে নেয়া প্রয়োজন তা হলো, আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? কারো কারো মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞান অর্জন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। তারা বলেন, শিক্ষা সম্পুর্ণরূপে নিরপেক্ষ হওয়া দরকার যাতে শিক্ষার্থী জীবন ও জগৎ সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য, সমস্যা ও ঘটনাবলীর সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু আমার মতে এ ধরনের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ শুধুমাত্র ক্যামেরার পক্ষেই সম্ভব মানুষের পক্ষে নয়। মানুষ শুধু চোখ দিয়ে দেখেই না তার পেছনে একটা মগজও থাকে। এটা কখনোও নিষ্ক্রিয় থাকে না। তার একটা দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত থাকে, জীবনের একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সে ঠিক করে সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার একটা প্রণালী সে তৈরী করে এবং মানুষ যা কিছু দেখে, শোনে এবং জানে তাকে তার ভেতরকার মৌলিক চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার সাথে সামঞ্জস্যশীলভাবে সাজিয়ে নেয়। তারপর সেই চিন্তা ও ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে তার জীবন পদ্ধতি গড়ে ওঠে। এই জীবন পদ্ধতিকেই আমরা সংস্কৃতি বলি। এখন আমরা যদি একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, আকীদা বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যের অধিকারী জাতি হয়ে থাকি এবং আমাদের আলাদা জীবনাদর্শ থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের নতুন বংশধরগণকে ঐ সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার বিকাশ ও উন্নয়নের যোগ্য করে গড়ে তোলা কর্তব্য। দুনিয়ার সকল জাতি এই উদ্দেশ্যেই নিজেদের স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে থাকে। পৃথিবীতে এমন একটা জাতিও আছে বলে আমার জানা নেই যারা আদর্শ নিরপেক্ষ কোন শিক্ষাব্যবস্থা নিজেদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং আপন নতুন বংশধরগণকে নিজ সংস্কৃতির কোন ছাপ নেই এমন শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করেছে।

অনুরূপভাবে একটা বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে হুবহু গ্রহণ করেছে এবং তাতে নিজস্ব সংস্কৃতির আলোকে কোন রদবদল না করেই সে অনুসারে আপন নতুন

বংশধরগণকে লেখা-পড়া শিখিয়েছে এমন কোন জাতিও পৃথিবীতে কোথাও আছে বলে আমি শুনিনি। এমন বোকামী আমরা যদি আগে দুর্বলতাবশত ও নিরুপায় হয়ে করে থাকি, তাহলে এখনও তা হুবহু চালু রাখার কোন অর্থ থাকতে পারেনা। এখন তো আমাদের জীবনব্যবস্থা আমাদেরই এখতিয়ারে, কাজেই অবশ্যই আমাদের কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি তথা ইসলামের যথার্থ সেবক ও রক্ষকরূপে নতুন বংশধর তৈরী করা। তাদেরকে এমনভাবে তৈরী করতে হবে যেন তারা ইসলামকে ভাল করে বুঝে, তার ওপর খাঁটি ঈমান রাখে, ইসলামের আদর্শ ও মূলনীতিকে ভালো করে জানে, সে অনুসারে সুদৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং আমাদের সামগ্রিক জীবনের সমগ্র কর্মক্ষেত্রকে আমাদের সংস্কৃতির মূলনীতির ভিত্তিতে চালাতে ও তার উন্নয়ন বিধান করতে সক্ষম হয়।

ধর্ম ও দুনিয়াদারীর পার্থক্য ঘুচাতে হবে ঃ

আমাদের দ্বিতীয় যে সিদ্ধান্তটি নিতে হবে তাহলো, দ্বীন ও দুনিয়া অর্থাৎ ধর্মীয় জীবন ও দুনিয়াবী জীবনের পার্থক্যের অবসান ঘটাতে হবে। এ জিনিসটাকে নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় একটি আদর্শ মূলনীতি হিসেবে স্থান দিতে হবে এবং এরই ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা রচনা করতে হবে। ধর্ম ও দুনিয়াদারীর পার্থক্য একটা খৃষ্টবাদী কুসংস্কার। বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম এবং যোগী-ঋষিদের ধর্মেও এই কুসংস্কার পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের ধারণা বিশ্বাস এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলিম জাতির শিক্ষাব্যবস্থায়, সমাজব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্ম ও দুনিয়াদারীর এ পার্থক্যকে যদি আমল দেয়া হয়, তাহলে এর চেয়ে মারাত্মক ভুল আর কিছু হবে না। আমাদের একটা শিক্ষা হবে ধর্মীয় এবং একটা দুনিয়াবী, এটা আমাদের কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমাদের মতে, আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা একই সাথে ধর্মীয় ও দুনিয়াবী দুই-ই হওয়া চাই। দুনিয়াবী এই হিসেবে যে, এ শিক্ষা গ্রহণ করে দুনিয়াকে বুঝবে এবং দুনিয়ার কাজ কারবার চালাবার যোগ্য হবে। আর ধর্মীয় এই হিসেবে যে, দুনিয়াকে তারা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝবে এবং ইসলামী বিধান অনুসারে দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। ইসলাম সেই ধর্ম নয়, যা মানুষকে দুনিয়ার কাজকর্ম বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারিতার সাথে চালাতে অনুমতি দিয়ে তার সাথে শুধুমাত্র গুটিকয়েক আকীদা-বিশ্বাস ও

আনুষ্ঠানিক ইবাদত-উপাসনার লেজুড় লাগিয়ে রাখতে বলবে। ইসলাম জীবনের শুধু একটা লেজুড় হয়ে আগেও তুষ্ট ছিল না, আজও এভাবে থাকতে চায় না। ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবনের জন্য পথপ্রদর্শক ও কর্মপন্থা নির্দেশক হবার দাবীদার। সে পার্থিব জীবন বহির্ভূত অতীন্দ্রিয় জগতের কথাই শুধু বলে না বরং গোটা দুনিয়াবী জীবন নিয়েই সে আলোচনা করে। ইসলাম দুনিয়াবী জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে। দুনিয়ায় মানুষের আগমনের উদ্দেশ্য কি, তার জীবনের লক্ষ্য কি, বিশ্বজগতে তার প্রকৃত অবস্থান কি এবং এই দুনিয়ায় তারা কি পন্থায়, কোন্ কোন্ মূলনীতির ভিত্তিতে কাজ করা উচিত তাও জানিয়ে দেয়। ইসলামের মতে ইহ্কাল হচেছ পরকালের কর্মক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে যে রকম বীজ রোপন করা হবে পরকালে ঠিক তেমনি ফল পাওয়া যাবে। এই ক্ষেতে কিভাবে চাষ দিতে হবে তাও সে শিক্ষা দেয়। পরকালে উত্তম ফল পেতে হলে দুনিয়ায় মানুষের কার্যপ্রণালী কি হওয়া উচিত তাও সে জানিয়ে দেয়। মুসলমানদের একটা শিক্ষা হবে দুনিয়াবী আর একটা হবে ইসলামী অথবা ইসলামকে একটা দুনিয়াবী শিক্ষার নেহায়েত লেজুড় বানিয়ে রাখা হবে। এ ধরনের একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা কখনো তা বরদাশত করতে পারে না। সে বরং চায় মানুষের গোটা শিক্ষাই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে হোক। যে ব্যক্তি দর্শন পড়বে সে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেই তা পড়ুক যাতে সে একজন মুসলিম দার্শনিক হতে পারে। ইতিহাস পড়লে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে পড়ুক যেন সে একজন মুসলিম ঐতিহাসিক হতে পারে। যে বিজ্ঞান পড়বে সে যেন মুসলিম বিজ্ঞানী রূপে গড়ে ওঠে। যে অর্থনীতি পড়বে সে যেন নিজ দেশের গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ইসলামী অর্থনীতির আলোকে সুগঠিত-পুনর্বিন্যস্ত করার যোগ্য হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়লে সে যেন নিজ দেশের শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে চালাতে সক্ষম হয়। আইন পড়লে যেন ইসলামের ইনসাফ ও ন্যায়নীতির মানদন্ডে মামলা মোকদ্দমার বিচার করতে সমর্থ হয়। এভাবে ইসলাম, ধর্ম ও দুনিয়াদারীর পার্থক্য খতম করে দিয়ে পুরো শিক্ষাকেই ইসলামী শিক্ষায় পরিণত করতে চায়। এর পর আলাদা কোন ধর্মীয় শিক্ষার কোন প্রয়োজনই থাকে না। আজকের এই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ই একদিকে যেমন ইমাম, মুফতিও আলেম তৈরী করবে, অপরদিকে সরকারী প্রশাসন চালানোর জন্য সেক্রেটারী এবং ডাইরেক্টর ও সরবরাহ করবে।

চরিত্র গঠন ঃ

নয়া শিক্ষাব্যবস্থার তৃতীয় মৌলিক জিনিস হলো, এতে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনকে পুথিগত বিদ্যার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হবে। শুধুমাত্র বই পুস্তক পড়ানো এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখানোতে আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে না। আমাদের প্রতিটি যুবকের মধ্যে ইসলামী চরিত্র, ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও ইসলামী মানসিকতা গড়ে উঠা প্রয়োজন, চাই সে ইঞ্জিনিয়ার হোক, বৈজ্ঞানিক হোক, সমাজ বিজ্ঞানী হোক অথবা বেসামরিক প্রশাসনের কোন কর্মকর্তা হোক তার মধ্যে ইসলামী মন-মগজ এবং ইসলামী চরিত্র অবশ্যই গড়ে উঠতে হবে। আমাদের শিক্ষা-নীতিতে এ জিনিসটি প্রধান লক্ষ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। যে ব্যক্তির ইসলামী চরিত্র নেই, সে আর যাই হোক, আমাদের জন্য কোন কাজেরই নয়।

নয়া শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তব রূপরেখা

উপরোক্ত মৌলিক কথাগুলো বলার পর এখন আমি আমার প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তব রূপরেখা সবিস্তারে তুলে ধরতে চাই।

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

সবার আগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসঙ্গে আসা যাক। কারণ এটাই হলো শিক্ষার ভিত্তিমূল। প্রচলিত প্রাইমারী স্কুলগুলোতে যেসব বিষয় পড়ানো হয়। শিক্ষার এই স্তরে তার সবই পড়ানো যেতে পারে। সারা বিশ্বে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে তাও কাজে লাগাতে হবে। তবে চারটে জিনিস সব পাঠ্য বিষয়ের মধ্যেই সন্নিবেশিত হতে হবে।

প্রথমতঃ শিশুর মনে এ কথাটি সর্বপ্রথম সত্য বলে বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে, এই দুনিয়াটা আল্লাহর সাম্রাজ্য এবং তাঁরই কুদরত ও শক্তিমত্তার বহিঃপ্রকাশ। এখানে মানব জাতি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত । এখানে আমাদের কাছে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে অর্পিত আমানত। এ আমানতের জন্য একদিন আমাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ পৃথিবীতে যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক না কেন, সর্বত্র আল্লহর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এগুলো সাক্ষ্য দিচেছ যে, একজন মহাপরাক্রান্ত শাসকের নিরংকুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে মহাবিশ্বের সকল জিনিস শাসিত হচেছ। আমরা চাই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিশু যখন ভর্তি হবে, সেই সময় থেকেই প্রাইমারী স্কুলের শেষ স্তর পর্যন্ত তাকে বিশ্ব জগতের সাথে এমনভাবে পরিচিত করে তুলতে হবে যেন তার প্রত্যেক পাঠে এই ধারণা-বিশ্বাস জন্মানোর উপকরণ ও উপাদান বিদ্যমান থাকে। এমনকি 'আ' বর্ণটি দ্বারা সে যেন আনবিক বোমা না শিখে 'আল্লাহ' কথাটি শিখে। এভাবে প্রথম দিন থেকেই শিশুদের মনে ইসলামী চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা জন্ম নিতে শুরু করবে এবং তাদেরকে এমনভাবে তৈরী করবে যে, শিক্ষার শেষ স্তর পর্যন্ত যখন তারা পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করবে তখনো এই মূলভিত্তি কার্যকর থাকবে।

দ্বিতীয়তঃ ইসলাম যে সব নৈতিক ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ পেশ করে তা প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ দেয়ার সময় এমন কি অংকের প্রশ্নমালার ভেতর দিয়ে পর্যন্ত

নানাভাবে শিশুদের মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে যে সব জিনিস ন্যায় ও ভালো তার প্রতি মর্যাদাবোধ এবং আগ্রহ শিশুদের মনে জন্মিয়ে দিতে হবে। যেসব জিনিস ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায় ও খারাপ তার প্রতি ছাত্রদের মনে সর্বোতভাবে ঘৃণা সৃষ্টি করে তা বদ্ধমূল করে দিতে হবে। আজ যেসব মুসলমান ঘুষ, দূর্নীতি ও তহবিল তসরূপের মত অপকর্মে লিপ্ত, তারাও এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই শিক্ষা নিয়ে বেরিয়েছে। পরবর্তী সময়ে এসব লোক নিজের জাতির লোকদের সাথে এহেন বেঈমানী করতে থাকে। এর কারণ হলো, তাদেরকে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে তাতে তোতা, ময়না, গরু, গাধা ও অজগর আনারসের সবক দেয়া হলেও আখলাক বা সচচরিত্রের সবক দেয়া হয়নি। আমরা চাই আমাদের ছাত্রদেরকে যে বিষয়ই পড়ানো হোক না কেন তাতে যেন চারিত্রিক শিক্ষা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হয়। ঘুষ, দূর্নীতি, হারাম উপায়ে অর্থোপার্জন, মিথ্যা, ধোকাবাজী, প্রতারণা, স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, বিলাসিতা, চুরি, নকল, ভেজাল ও জাল, ওয়াদা খেলাপ, তহবিল তসরূপ, মদ্যপান, সুদখোরী, জুয়া, জুলুম, বে-ইনসাফী ও মানুষের হক নষ্ট করার কঠোর সমালোচনা ও এ সবের খারাপ পরিণতির উল্লেখ করে এর বিরুদ্ধে তাদের মনে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করে দিতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে এমন একটা মত গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে যে, যার মধ্যে তারা এসব নৈতিক দোষ দেখতে পাবে তাকেই যেন খারাপ দৃষ্টিতে দেখে এবং তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ ও প্রকাশ করে। এমন কি এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া শিখে পরবর্তী সময়ে কেউ যদি এই জাতীয় দোষ-ত্রুটিতে আক্রান্ত হয় তাহলে তার সহপাঠিরাই যেন তাকে ভর্ৎসনা করে ও ধিক্কার দেয় এবং তার প্রশংসা ও সহযোগিতা না করে। আমরা চাই ইসলাম যেসব সৎ গুণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে চায় সেগুলো যেন পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে এমনভাবে তুলে ধরা হয়, তার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়, তার প্রশংসা করা হয়, তার উপকারিতা বুঝিয়ে বলা হয় যে, এইসব সৎ গুণ মনুষ্যত্বের জন্য অপরিহার্য এবং মানুষের কল্যাণ এগুলোর মধ্যেই নিহিত। শিশুদের হৃদয়গ্রাহীভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, একজন মানুষের প্রকৃত গুণ-বৈশিষ্ট্য কি কি এবং একজন ভালো মানুষ কেমন হয়ে থাকে তাদেরকে সততা ও সত্যবাদিতা আমানতদারী ও ওয়াদা পালন, ইনসাফ, ন্যায়নীতি ও সত্যপ্রীতি, সহানুভূতি ও সৌভ্রাতৃত্ব, ত্যাগ-তিতিক্ষা,

কর্তব্যপরায়ণতা ও আত্মসংযম, হালাল উপার্জন ও হারাম বর্জন এবং সর্বোপরি গোপন ও প্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করার শিক্ষা দিতে হবে। বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়েও তাদের মধ্যে এসব গুণ সৃষ্টি ও বিকাশের চেষ্টা চালাতে হবে।

তৃতীয়তঃ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকালেই শিশুদের মনে ইসলামের জ্ঞান এবং আকীদা ও ঈমানের বিষয়গুলো বদ্ধমূল করে দিতে হবে। এ জন্য যদি আলাদাভাবে দ্বীনিয়াতের পাঠ্যসূচীর প্রয়োজন হয় তবে তা প্রণয়ন করা যেতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই শুধু একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করা উচিত হবে না। বরং ঈমান-আকীদার বিষয়গুলো অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যেও এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যেমন দেহের সকল অংগ-প্রত্যাংগে প্রাণ-প্রবাহ ছড়ানো থাকে। প্রত্যেক মুসলিম শিশুর মনে তাওহীদের আকীদা, আখেরাতের বিশ্বাস, কুরআনের সত্যতা এবং শিরক, কুফর ও নাস্তিকতার অসত্য ও বাতিল হওয়ার বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দিতে হবে। এই শিক্ষা প্রক্রিয়া এমনভাবে চালাতে হবে যেন শিশু মনে না করে বসে যে, তাকে জোর করে কতকগুলো কথা মানতে বাধ্য করা হচ্ছে। বরং সে বুঝবে যে এগুলোই বিশ্বজগতের সর্বাপেক্ষা যুক্তিগ্রাহ্য বাস্তবতা। এগুলো জানা ও মানা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য। আর এগুলো না মানলে মানুষের জীবন সঠিকভাবে চলতে পারে না।

চতুর্থতঃ শিশুকে ইসলামী জীবন যাপন প্রণালী শেখাতে হবে। এ পর্যায়ে দশ বছরের বালক বালিকার জন্য যা শেখা দরকার সেসব মাসয়ালা-মাসায়েল শিখিয়ে দিতে হবে। পাক-পবিত্র হওয়ার নিয়ম-কানুন, অযুর মাসয়ালা, নামায-রোযার নিয়ম, হালাল-হারামের সীমা, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর হক, পানাহারের নিয়ম-কানুন, পোশাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত শরীয়তের বিধান এবং সামাজিক জীবনের শরীয়ত ও রুচিসম্পন্ন আচরণবিধিসহ যেসব বিষয় প্রত্যেক মুসলমান বালক-বালিকার জানা অপরিহার্য তা যেন তাদেরকে শুধু বলাই না হয়। বরং তারা যেন ভালমত হৃদয়ঙ্গম করে যে, মুসলমানদের জন্য এ ধরনের বিধানই থাকা প্রয়োজন। এগুলো সম্পূর্ণ সত্য এবং সুসভ্য, মার্জিত ও পবিত্র জীবন যাপনের জন্য এসব বিধান অবশ্যই মেনে চলা উচিত।

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ

এরপর হাইস্কুলের শিক্ষার কথা ধরুন। এ স্তরে সর্বপ্রথমে যেটা আমি জরুরী মনে করি তা হলো আরবী ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো। ইসলামের মূল উৎস সম্পূর্ণ আরবী ভাষায় লিখিত। কুরআনের ভাষা আরবী, হাদীসের ভাষা আরবী এবং আমাদের প্রথম শতকগুলোর প্রাচীন আলেম ও ফিকাহ বিশারদগণের যাবতীয় গ্রন্থ এবং ইসলামের ইতিহাসের সমস্ত প্রামাণ্য মৌলিক গ্রন্থ আরবী ভাষাতেই লিপিবদ্ধ। কুরআনের শুধু তরজমা পড়লে কাজ হবে না। বরং এর মূল ভাষায় সরাসরি পড়া দরকার। নতুবা ইসলামের প্রকৃত মর্ম তাৎপর্য এবং ইসলামী মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য তরজমার প্রসার ঘটা দরকার যাতে জনসাধারণ জানতে পারে যে তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ কি? তবে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে আরবী জানবে না এমন লোক থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এ জন্য আমরা আরবীকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে চালু করতে চাই। আমাদের মতে হাইস্কুলের শিক্ষা শেষে একজন ছাত্রের এতটা আরবী জ্ঞান হওয়া উচিত যেন সে যে কোন সহজ আরবী বাক্য পড়তে ও বুঝতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বিতীয় বাধ্যতামূলক বিষয় হওয়া উচিত পবিত্র কুরআন। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর অন্তত দু'পারা-কুরআন শরীফ অর্থ বুঝে পড়া ম্যাট্রিক পাশ করার জন্য অপরিহার্য হওয়া উচিত। সময় বাঁচানোর জন্য হাইস্কুলের শেষ স্তরে কুরআনের মাধ্যমেই আরবী শেখানো যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ বাধ্যতামূলক বিষয় হবে ইসলামী আকায়িদ। এই পর্যায়ে ছাত্রদেরকে ঈমান-আকীদার বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে অবহিত করতে হবে। অতঃপর ঐসব আকীদা-বিশ্বাসের যুক্তি প্রমাণ কি, প্রয়োজন কি, মানুষের কর্ম জীবনের সাথে তার সম্পর্ক, তা মানা না মানার কি প্রভাব কর্ম জীবনের উপর পড়ে এবং ঐসব আকীদা-বিশ্বাসের নৈতিক ও বাস্তব চাহিদা কি, এসব কথা ছাত্রদের মন-মগজে এমনভাবে বদ্ধমূল করাতে হবে যে তারা যেন ওগুলোকে শুধু বাপ দাদার ধর্মীয় বিশ্বাস হিসেবে না মানে বরং তা তার নিজস্ব মতে পরিণত হয়।

ইসলামী আকায়িদের সাথে সাথে ইসলামী নৈতিকতার বিষয়কেও প্রাথমিক শিক্ষার চাইতে মাধ্যমিক শিক্ষায় আরো বেশী বিস্তারিতভাবে ও আরো বেশী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহকারে বর্ণনা করতে হবে। সেই সাথে ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ইসলামের এসব নৈতিকতা বা আখলাক নিছক কাল্পনিক মতবাদ ও আদর্শ নয় বরং এ ধরনের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী

মানুষ মুসলিম সমাজে বর্তমান। এরূপ জ্ঞান দানের সাথে সাথে ছাত্রদের মধ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা নিজেরাও সেগুলোকে খারাপ মনে করে তা থেকে দূরে থাকে এবং সমাজে ঐসব খারাপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোককে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার সুযোগ না দেয়। পক্ষান্তরে ইসলাম যেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে পছন্দ ও প্রসংশনীয় মনে করে তা যেন তারাও পছন্দ করে, নিজেদের মধ্যে তার বিকাশ-বৃদ্ধি ঘটায় এবং সমাজেও অনুরূপ চরিত্রের লোককে উৎসাহিত করে।

ম্যাট্রিক পর্যন্ত পৌঁছতে ছাত্ররা প্রায়ই যৌবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। এ পর্যায়ে তার ইসলামী জীবন-পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষার চাইতে বিস্তারিত শিক্ষা বেশী করে দরকার হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে পৌঁছে তাকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন এবং লেনদেন ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব বিধি-বিধান জানা দরকার একজন যুবক হিসেবে তা তাকে জানতে হবে তবে মুফতী হবার মত বিস্তারিত জানতে হবে, এমন কোন প্রয়োজন নেই। তার জানাশোনার মান এতটা অবশ্যই হতে হবে একজন মুসলমান হিসেবে জীবন-যাপন করার জন্য যতটা জ্ঞান তার থাকা দরকার। আজকাল দেখা যায় উচ্চতর শিক্ষালাভকারী ব্যক্তিরাও বিয়ে ও তালাকের সাধারণ মাসয়ালা সম্পর্কেও আদৌ জ্ঞান রাখে না। এর ফলে অনেক সময় তারা মারাত্মক ভুল করে বসেন। তারপর মাসয়ালা জিজ্ঞেস করে বেড়ান। অথবা লেনদেনের ব্যাপারে ইসলামী বিধানের মামুলী জ্ঞান আমাদের সর্বোচচ শিক্ষিত ব্যক্তিরাও রাখেন না। ফলে ইসলামী বিধান মোতাবেক চলার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও নিছক অজ্ঞতার কারণে ভুল করেন। এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া কিছুতেই কাম্য নয়।

ইতিহাস শিক্ষার বেলায় শুধু নিজ দেশের ইতিহাস নয় বরং ইসলামের ইতিহাসও পড়া উচিত। তাদেরকে নবীদের ইতিহাসও জানা উচিত। এতে ছাত্ররা বুঝতে পারবে, ইসলাম একটা চিরন্তন ও শাশ্বত আন্দোলন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আকস্মিকভাবে এর অভ্যুদয় ঘটেনি। হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনীও পড়া প্রয়োজন যাতে তারা মানবতার আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হতে পারে। খেলাফতে রাশেদার যুগ থেকে এ যাবত কালের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়িয়ে দিতে হবে। তাহলে সে জানতে পারবে মুসলিম জাতি কোন কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত

হয়েছে। এসব ঐতিহাসিক জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত জরুরী : যে জাতির তরুণ সমাজ নিজেদের অতীত ইতিহাস জানে না, তারা আপন জাতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে না ।

এসব শিক্ষাদানের সাথে সাথে আমরা এটাও চাই যে, হাই স্কুল পর্যায়ে ছাত্রদের হাতেকলমে ট্রেনিং দেয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হোক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রতিটি ছাত্রকে নিয়মিত নামায পড়তে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে এবং বে-নামাযী ছাত্রকে কেউ যেন বরদাশত না করে এমন সাধারণ মত গড়ে তুলতে হবে। বিধি অনুসারে স্কুলে এমন কোন ছাত্রকে থাকতে দেয়া যাবে না যে স্কুল চলাকালে নামায পড়ে না। এরূপ কড়াকড়ি এই জন্য প্রয়োজন যে, সক্রিয় ও বাস্তব ইসলামী জীবন গড়া নামায ছাড়া সম্ভবই নয়। এই ভিত্তিটিই যদি ধ্বসে পড়ে তাহলে ইসলামী জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। এদিক দিয়েও আপনাকে ভেবে দেখতে হবে যে, একদিকে একজন ছাত্রকে আপনি বলছেন, নামায ফরয। এটি আল্লাহ তায়ালাই ফরয করেছেন। অপর দিকে ফরয জানা ও মানা সত্ত্বেও সে যদি নামায না পড়ে তাতে কোন দোষ ধরা হয় না। এর অর্থ দাঁড়ায়, আপনি প্রতিদিন ছাত্রকে মোনাফেকী, দায়িত্ব ফাঁকি দেয়া এবং দুর্বল চরিত্রে অভ্যস্ত করছেন। এ ধরনের শিক্ষা ও ট্রেনিং পেয়ে যারা বের হবে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হবে এটা কি আপনি আশা করতে পারেন? কখনো তা আশা করা যায় না। এতটা কর্তব্য ফাঁকি দেয়ার পর অন্যান্য কর্তব্যেও ফাঁকি দেয়ার মনোবৃত্তি ও তার মধ্যে গড়ে উঠবে। এমতাবস্থায় ঐ ছাত্রকে ভর্ৎসনা না করে ঐ শিক্ষাব্যবস্থাকেই ধিক্কার দেয়া উচিত, যে শিক্ষাব্যবস্থা তাকে প্রথম দিন থেকেই শিখিয়েছিল দায়িত্ব এমন জিনিস, যাকে জেনে শুনে অবজ্ঞা করা যায়। নিজেদের তরুন সমাজকে স্বয়ং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যহীনতার শিক্ষা দেয়ার পর কখনো এ আশা করা যায় না যে, তারা দেশ ও জাতির প্রতি আনুগত্যশীল হবে। পাঠ্যসূচীতে মহৎ গুণাবলী ও উচ্চতর আদর্শের বুলি আওড়িয়ে কি লাভ যদি সেই আদর্শ ও সেই গুণাবলীকে চরিত্রে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা না করা হয়? মনে মনে উচচ মূল্যবোধ পোষণ করা এবং কাজে তার বিরুদ্ধাচারণ করে যাওয়ায় ক্রমান্বয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বই অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায়। এ রকম অন্তঃসারশূণ্য অসার ব্যক্তিত্ব ও দুর্বল চরিত্র নিয়ে হাজার বিদ্যা বুদ্ধি থাকলেও কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখানো সম্ভব নয়।

সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরেই যখন নতুন বংশধরগণ কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পন করে তখনই এক একজন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে দৃঢ় চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। তাদের মনে এ কথা বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে, তোমাদের কাজের সাথে তোমাদের জ্ঞানের সঙ্গতি রাখা প্রয়োজন। যে জিনিসকে সত্য, সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত মনে করবে তা মেনে চলো। যেটা কর্তব্য মনে করবে তা পালন করবে, যেটাকে ভাল বলে জানবে তা গ্রহণ করবে এবং যেটাকে খারাপ বলে জানবে তা বর্জন করবে।

উচ্চ শিক্ষা ঃ

এবার আমি উচচ শিক্ষার কথা বলতে চাই। উচচ শিক্ষার জন্য একটা সাধারণ পাঠ্যসূচী থাকবে আর একটা থাকবে বিশেষ পাঠ্যসূচী। সাধারণ পাঠ্যসূচীটা সকল বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক থাকবে। আর বিশেষ পাঠ্যসূচী প্রত্যেক বিষয়ের ছাত্রকে তার বিষয়ের সাথে এর সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য অনুসারে পড়ানো হবে।

সাধারণ পাঠ্যসূচীতে আমার বিবেচনায় তিনটে বিষয় থাকা উচিত ঃ

(১) **পবিত্র কুরআন ঃ** কুরআন এমনভাবে পড়াতে হবে যেন ছাত্ররা কুরআনের শিক্ষা কি তা ভালো করে জানতে ও বুঝতে পারে এবং সেই সাথে তার আরবী ভাষা জ্ঞানও এতটা উন্নতি লাভ করবে যে, তারা যেন অনুবাদ ছাড়াই ভালভাবে বুঝতে পারে।

(২) **হাদীসের একটা সংক্ষিপ্ত সংকলন ঃ** এতে এমন হাদীস সংকলিত হবে যা ইসলামের মূলনীতি, নৈতিক শিক্ষা এবং হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করে। এ সংকলনটাও অনুবাদ ছাড়াই হওয়া চাই, যাতে ছাত্রদের ইসলামী জ্ঞানের পাশাপাশি আরবী জ্ঞানেরও উৎকর্ষতা আসে।

(৩) **ইসলামী জীবন-পদ্ধতি ঃ** এটা হবে ইসলামী জীবন-পদ্ধতির একটা পূর্ণাঙ্গ কাঠামো। এতে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে ইবাদত, আখলাক, সামাজিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতির কাঠামো, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং যুদ্ধ ও সন্ধি পর্যন্ত ইসলামী বিধানের যাবতীয় দিক ও বিভাগ যুক্তিগ্রাহ্য ও প্রমাণাদিসহ বর্ণনা করতে হবে যাতে প্রত্যেক শিক্ষিত যুবক ইসলামকে ভালো করে বুঝতে পারে

এবং পরবর্তী সময়ে জীবনের যে কর্মক্ষেত্রেই এবং যে পেশাতেই তারা যাবে, ইসলামী ভাবধারা ও মূল্যবোধ এবং ইসলামের মূলনীতি ও বিধানকে অনুকরণ করে যেন কাজ করতে পারে।

বিশেষ পাঠক্রম ঃ

আলাদা আলাদাভাবে এক একটা বিষয় পড়াশোনা করার জন্য এটা তৈরী করা হবে এবং তা শুধু ঐ বিষয়ের ছাত্রকেই পড়ানো হবে। যেমন ঃ যেসব ছাত্র দর্শন পড়বে তাদেরকে অন্যান্য দর্শনের সাথে সাথে ইসলামী দর্শনও পড়ানো হবে। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যে, মুসলমানরা এরিষ্টটল, প্লেটো এবং প্লেটো দর্শনবাদীদের নিকট থেকে যেসব দর্শন গ্রহণ করেছে এবং সেভাবেই তাদের উৎকর্ষতা দান করেছে তা ইসলামী দর্শন নয়। আর গ্রীক দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাদের আকীদা-তত্ত্বকে যে কালামশাস্ত্র বা আকীদা-তত্ত্ব প্রণয়ন করেছেন, সেটাও ইসলামী দর্শনের অন্তর্ভূক্ত নয়। মুসলিম মনীষীগণ ইসলামী আকীদা-তত্ত্বকে সমকালীন দার্শনিক মতবাদ সমূহের আলোকে ও তৎকালীন যুক্তিবিদ্যার ভাষায় বর্ণনা করতে গিয়েই এ শাস্ত্রের সূচনা ঘটান। এ দুটো বিষয় এখন ঐতিহাসিক স্মৃতির চেয়ে বেশী গুরুত্ব বহন করে না। এ দুটো বিষয় অবশ্যই পড়াতে হবে। তবে দর্শনের ইতিহাসের দুটো গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবেই পড়াতে হবে যা পাশ্চাত্য গ্রন্থকারগণ সাধারণভাবে পাশ কেটে গিয়েছেন। তারা শিক্ষার্থীদের মনে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল করতে চেয়েছেন যে, দুনিয়ার বুদ্ধি-বৃত্তিক বিকাশে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যা কিছু অবদান রাখা হয়েছে, ইউরোপীয়রাই রেখেছে। কিন্তু মুসলিম দার্শনিক ও কালাম শাস্ত্রবিদদের এ অবদান 'ইসলামী দর্শন' ছিল না এবং আজকের শিক্ষার্থীদেরকে ঐ নামে ওটা পড়ানোও সঙ্গত নয়। পড়ানো হলে সেটা হবে চরম বিভ্রান্তিকর এবং তাদেরকে বিপদগামী করার নামান্তর। প্রকৃত পক্ষে ইসলামী দর্শন কোথাও তৈরী অবস্থায় বর্তমান নেই। ওটা আমাদের এখন নতুন করে গড়ে তুলতে হবে এবং তা দাঁড় করাতে হবে কুরআন প্রদত্ত ভিত্তির ওপর। কুরআন মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমানা চিহ্নিত করে। অপরদিকে দেখিয়ে দেয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসগুলোর পেছনে লুকিয়ে থাকা সত্যের সন্ধান লাভের নির্ভুল পথ। সে যুক্তিবিদ্যার ত্রুটিপূর্ণ যুক্তিপ্রয়োগ-রীতি বাদ দিয়ে সাধারণ বোধগম্য সহজ সরল যুক্তি প্রয়োগের রীতি শিক্ষা দেয়। সর্বোপরি সে মানুষ ও বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ মতবাদও

পেশ করে। সে মতবাদের ভেতরে মানুষের মন-মগজে প্রতিনিয়ত তোলপাড়কারী যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর বিদ্যমান। এ সব তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে একটা নতুন যুক্তিবিদ্যা, একটা নতুন অতিন্দ্রীয় দর্শন, একটা নতুন চারিত্রিক ও নৈতিক দর্শন এবং একটা নতুন মনোবিজ্ঞান রচনা করা যায় এবং এখন তা রচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। দর্শনের মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে যারা আজ নতুন পুরানো দর্শনের গোলক ধাঁধায় দিশেহারা ও বিভ্রান্ত, তারা যাতে নিজেরাও ভ্রান্তিমুক্ত হবার সঠিক পথ খুঁজে পায় এবং জগদ্বাসীকেও আলোকজ্জ্বল পথের সন্ধান দিতে পারে সে জন্য এই নবতর দর্শন রচনা করা আবশ্যক।

অনুরূপভাবে ইতিহাসের ছাত্রদেরকে দুনিয়ার আর যত ইতিহাস পড়ানো হোক, ইসলামের ইতিহাসও পড়াতে হবে এবং ইতিহাস দর্শনের অন্যান্য মতবাদের সাথে সাথে ইসলামের ইতিহাস দর্শনের শিক্ষাও দিতে হবে। এ দুটো বিষয়ও কিছুটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তা না হলে এ ক্ষেত্রে যে একটা সাধারণ ভুল ধারণা আছে তার কারণে আমার বক্তব্য বুঝতে আপনাদের অসুবিধা হবে বলেই আমার আশঙ্কা। ইসলামের ইতিহাস বলতে সাধারণ মুসলিম জাতি ও দেশসমূহের ইতিহাস অথবা মুসলমানদের সভ্যতা, কৃষ্টি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ইতিবৃত্তকে বুঝানো হয়ে থাকে। আর ইসলামী ইতিহাস দর্শনের নাম শুনতেই একজন সাধারণ ছাত্র ইবনে খালদুনের দিকে তাকাতে আরম্ভ করে। আমি এ দুটো বিষয়ের গুরুত্ব অস্বীকার করি না এবং বিষয় দুটো পড়ানোরও বিরোধিতা করি না। আমি শুধু এ কথাটা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, ইসলামের ইতিহাস এবং মুসলমানদের ইতিহাস সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। আর ইবনে খালদুনের ইতিহাস দর্শনের সাথে তা ইসলামের ইতিহাসের দর্শনের কোন সামান্যতম সম্পর্কও নেই।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ইতিহাস বলতে যা বুঝায় তা হলো ইতিহাসের আবর্তনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামে দীক্ষিত জাতিগুলোর ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, কৃষ্টি, চরিত্র, সভ্যতা ও রাজনীতি এবং সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজব্যবস্থায় ইসলামের যে কালজয়ী প্রভাব পড়েছে তার পর্যালোচনা। আর ঐ প্রভাবের সাথে অন্যান্য অইসলামী মতাদর্শের প্রভাব যুগে যুগে কিভাবে কতটুকু সংমিশ্রিত হয়েছে এবং সেই মিশ্রনের কি ফলাফল দেখা দিয়েছে তাও খতিয়ে দেখা ইসলামের ইতিহাসের আওতাভুক্ত। অনুরূপভাবে ইসলামের ইতিহাস দর্শন বলতে কুরআনের ইতিহাস দর্শনই বুঝায়। কুরআন আমাদেরকে মানব জাতির ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণের সন্ধান দেয়, এই অধ্যয়ন থেকে

মতবাদ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য একটা বিষয়ে পথ ও পদ্ধতি নির্বাচন করে দেয় এবং মানব জাতির উত্থান পতনের কারণ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে। দুঃখের বিষয়, ইসলামী দর্শনের মত ইসলামী ইতিহাস ও ইতিহাস দর্শন নিয়েও আজ কোন পাঠ্য বই লেখা হয়নি। এ দুটো বিষয় নিয়ে কিছু গ্রন্থ রচনা করে শুণ্যতা পূরণের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। নচেত আমাদের ইতিহাস শিক্ষার ক্ষেত্রে এ শুণ্যতা থেকেই যাবে।

সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, এর প্রতিটি শাখা সম্পর্কে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে এবং প্রতিটি শাখা সম্পর্কেই ইসলামের নিজস্ব নীতিমালা রয়েছে। সুতরাং এর প্রত্যেকটা বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার সময় ঐ বিদ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট ইসলামী জ্ঞানদান করা অবশ্য কর্তব্য। উদাহরণ স্বরূপ ঃ অর্থনীতিতে ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইসলামী রাজনৈতিক মতবাদ ও ব্যবস্থা ইত্যাদি। এরপর আসে কারিগরী বিদ্যা যথা, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা। এগুলোর ব্যাপারে ইসলামের কিছু বলার নেই। এতে কোন বিশেষ ইসলামী পাঠ্যসূচীর প্রয়োজনও নেই। ইতিপূর্বে যে সাধারণ পাঠ্যক্রম ও নৈতিক ট্রেনিং এর কথা আমি বলেছি, এ ক্ষেত্রে সেটাই যথেষ্ট।

বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের শিক্ষা ঃ

উচচ শিক্ষার পর আসে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের শিক্ষাদানের কথা। এর উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানের বিশেষ কোন শাখায় পূর্ণতা ও পরিপক্কতা লাভ করা। অন্যান্য বিজ্ঞানের ও শিল্প কলার ক্ষেত্রে যেমন বিশেষজ্ঞ তৈরীর উদ্দেশ্যে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে, তেমনি কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনি ব্যবস্থা থাকা দরকার, যাতে আমাদের মধ্যেও উচচমানের মুফাস্‌সির, হাদীস বিশারদ, ফিকাহবিদ ও ইসলামী জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন লোক তৈরী হতে পারে। আমার মতে ফিকাহশাস্ত্রের শিক্ষারব্যবস্থা আইন কলেজগুলোতেই হওয়া উচিত। কারণ ইসলামী আইনই এখন আমাদের দেশের আইন হওয়া দরকার। ইসলামী আইন শিক্ষা পদ্ধতি কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে আমি অন্য দুটি ভাষণে বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করেছি। আমি সে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি এখানে করবো না। এখন থাকলো কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ তৈরী করার দায়িত্ব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই বিশেষ ব্যবস্থাধীনে নিতে হবে। এ সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা কাঠামো এখানে পেশ করছি। আমার

মতে এ উদ্দেশ্যে শিক্ষাদানের জন্য কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। সেখানে শুধু গ্রাজুয়েট অথবা আন্ডার গ্রাজুয়েটদের ভর্তির ব্যবস্থা থাকবে। এসব প্রতিষ্ঠানে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে ঃ

(১) আরবী সাহিত্য ঃ ছাত্রদের মধ্যে আরবী ভাষার উচচমানের গ্রন্থাবলী পড়ার ও বুঝার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে এবং আরবী ভাষায় লিখতে ও কথা বলতে পারে এমন পর্যায়ে তাদেরকে উন্নীত করতে হবে।

(২) কুরআন শিক্ষা ঃ এ ক্ষেত্রে তাফসীরের মূলনীতি, তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস ও এই শাস্ত্রের বিবিধ মত ও চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ছাত্রদের জ্ঞান দান করতে হবে। অতঃপর কুরআনের গবেষণামূলক ও তাত্ত্বিক অধ্যয়নের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৩) হাদীস শিক্ষা ঃ হাদীস শিক্ষার ক্ষেত্রে হাদীসের মূলনীতি বা উসূলে হাদীস, হাদীসের ইতিহাস এবং বিশুদ্ধতা যাচাইবাছাইয়ের বিধান পড়ানোর পর মূল গ্রন্থসমূহ এমনভাবে পড়াতে হবে যেন ছাত্ররা একদিকে হাদীস পরখ করা এবং তার বিশুদ্ধতা যাচাই-বাছাই করে নিজে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যোগ্য হয়ে ওঠে। অপর দিকে বেশীর ভাগ হাদীস সম্পর্কে মোটামুটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়।

(৪) ফিকাহ ঃ আইন কলেজসমূহে যে ভাবে ফিকাহ শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রে ফিকাহ শিক্ষাদান তা থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের হবে । এ ক্ষেত্রে ছাত্রদেরকে শুধু ফিকাহর মূলনীতির (উসূলে ফিকাহ) ইতিহাস, ফিকাহ শাস্ত্রীয় বিভিন্ন মাযহাবের বৈশিষ্ট্যাবলী এবং কুরআন ও হাদীস থেকে আইন-বিধান রচনার পদ্ধতি ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

(৫) আকীদা শাস্ত্র ঃ কালাম শাস্ত্র ও তার ইতিহাস এমনভাবে পড়াতে হবে যাতে ছাত্ররা জ্ঞানের এই শাখা সম্পর্কে যথার্থ পরিচয় লাভ করতে পারে এবং মুসলিম কালাম শাস্ত্রবিদদের সমগ্র জ্ঞান-গবেষণা সম্পর্কে তাদের মধ্যে ব্যাপক ও গভীর ব্যুৎপত্তি জন্মে।

(৬) তুলনামূলক ধর্ম অধ্যয়ন ঃ এ পর্যায়ে দুনিয়ার সমস্ত বড় বড় ধর্মমতের মৌলিক শিক্ষা, প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দান করতে হবে। এভাবে বিশেষ পর্যায়ে শিক্ষা লাভ করে যারা বের হবে তাদের ডিগ্রীর মান কি হবে, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। তবে আমি একথা বলতে চাই যে, এসব লোকদেরকেই আমাদের সমাজে আলেম নামে অবহিত

হওয়া উচিত। আর যেসব উচ্চতর চাকুরীতে এম.এ, পি.এইচ.ডি ডিগ্রীধারী লোকেরা নিয়োগ লাভ করে থাকেন, সেসব চাকুরীর দুয়ার এদের জন্য উন্মুক্ত হতে হবে।

অত্যাবশ্যকীয় আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা ঃ

ধর্মীয় ও দুনিয়াবী শিক্ষার আলাদা আলাদা ব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন করে একটা একক ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার মোটামুটি চিত্র আমার উপরোক্ত আলোচনায় পেশ করা হয়েছে। এদেশে এ শিক্ষাব্যবস্থাই কায়েম হওয়া দরকার। এ আলোচনা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হতে বাধ্য যদি প্রচলিত শিক্ষা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন (Overhaul) ব্যবস্থা গৃহীত না হয়।

এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম করণীয় হলো শিক্ষানীতির দায়িত্ব এমন লোকদের হাতে দিতে হবে যারা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞানের অধিকরী এবং তা বাস্তবায়িত করতেও আগ্রহী। এ রকম লোকদের হাতেই শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন সম্ভব। যারা ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা কি তা জানে না এবং তা বাস্তবায়নের ইচছাও রাখে না তাদের দ্বারা এ কাজ সম্ভব হবে না। এ ধরনের লোক যদি শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণ করে আর জনগণ রাতদিন একটানা হৈ চৈ করে এবং চাপের মুখে তাদেরকে এ কাজ করতে বাধ্য করে, তা হলে অনিচছা সত্ত্বেও তারা কিছু সংস্কারের কাজ করতে থাকবে যা এখন কিছু কিছু হচেছ। কিন্তু এতে কোন ফল হবে না।

দ্বিতীয়তঃ মাদ্‌রাসা ও স্কুলের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা নির্ধারণের সময় তাদের নৈতিক চরিত্র ও ধর্মপরায়ণতাকে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মত এমনকি তার চেয়েও বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। ভবিষ্যতের শিক্ষক ট্রেনিং এর ক্ষেত্রেও এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রয়োজনীয় রদবদল ও সংস্কার করতে হবে। শিক্ষা সম্পর্কে যার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে সে এ কথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় সিলেবাস ও পাঠ্য-পুস্তকের চাইতে শিক্ষক এবং তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব অনেক বেশী গুরুত্ববহ। আকীদা-বিশ্বাস যার বিকারগ্রস্থ, নৈতিক চরিত্র যার নষ্ট, সে শিক্ষক আর যাই হোক এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রদের যে নৈতিক চরিত্র ও মন-মানসিকতা আমাদের একান্ত কাম্য তার প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে ভ্রষ্ট লোকদের দ্বারা যেটুকু ক্ষতি হয় তা প্রধানত বর্তমান বংশধর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ

থাকে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা যদি খারাপ ও ভ্রষ্ট লোকদের হাতে থাকে তা হলে তারা ভবিষ্যত বংশধরদেরও সর্বনাশ সাধন করে। ফলে ভবিষ্যতের জন্যও কোন সংস্কার সংশোধন বা কোন কল্যাণকর পরিবর্তনের আশা অবশিষ্ট থাকে না।

এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা হলো, শিক্ষাঙ্গনের গোটা পরিবেশই পাল্টিয়ে তা ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারা অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। এই সহশিক্ষা, ফিরিঙ্গীপনার প্রদর্শনী, আপাদমস্তক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কৃষ্টির সর্বাত্মক আধিপত্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কানুষ্ঠান ও আলোচনা এবং নির্বাচনের প্রচলিত ব্যবস্থা সব যদি এভাবেই চলতে থাকে এবং এর কোন কিছুই বদলাতে আমরা প্রস্তুত না হই তাহলে ইসলামী জীবনব্যবস্থা নিয়ে বৃথা এই গালভরা বুলি আওড়ানো আর ইসলামের এই জিগির তোলা বন্ধ করা উচিত। শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান পরিবেশ ইসলামের বীজ অংকুরণের সহায়ক নয়। এ প্রতিকূল পরিবেশ বহাল রেখে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা লবণাক্ত জমিতে চাষাবাদ করে ফসল ফলানোর চেষ্টার চেয়েও আহম্মকি। একদিকে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান লংঘন করে যুবক-যুবতীদের এক সঙ্গে বসানো হচেছ। অপরদিকে তাদের মধ্যেই ইসলাম ও ইসলামী বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হওয়ার আশা পোষণ করা হচেছ। একদিকে যাবতীয় চাল-চলন ও গোটা পরিবেশ দ্বারা তরুণ সমাজের মনে পাশ্চাত্য সভ্যতা, কৃষ্টি উচ্ছৃঙ্খল জীবন-ধারার প্রভাব বদ্ধমূল করা হচ্ছে; অপরদিকে কেবল মুখের কথায় বা সাধু বচনের মাধ্যমে তাদেরকে জাতীয় কৃষ্টি ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করার বাসনা পোষণ করা হচেছ। একদিকে প্রবীন সমাজ তরুণ শ্রেণীকে বিতর্ক অনুষ্ঠানাদিতে প্রতিনিয়ত বিবেকের বিরুদ্ধে ট্রেনিং দিয়ে চলেছে; অপরদিকে তারাই আবার তরুণদের কাছ থেকে সততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায় নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখতে আগ্রহী। একদিকে ছাত্রদেরকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জাতীয় রাজনৈতিক জীবনকে কলুষিতকারী চিরাচরিত নির্বাচনী অপকৌশলগুলো প্রয়োগে অভ্যস্থ করে তুলছে; অপরদিকে তাদেরকেই ছাত্র জীবন শেষে একেবারে সাধু সজ্জন হিসেবে দেখবার স্বপ্ন দেখা হচেছ। এরূপ বৈপরীত্য কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কাজ হতে পারে না। এ ধরনের লোকদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার আগে পাগলা গারদে গিয়ে নিজেদের মাথা ঠিক করে আসা উচিত।

একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা

মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সূচিত করার তাগিদ এখন মুসলিম জাহান জুড়ে আলোড়ন তুলেছে। মুসলিম তরুণদেরকে সারা দুনিয়ায় সঠিক ইসলামী লক্ষ্যাভিসারী নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্য করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নতুন ধরনের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য কয়েকটি মুসলিম দেশে ইদানিং কথাবার্তা চলছে। এ উদ্দেশ্যে এ যাবত যে কটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলোর পরিকল্পনা ও কাজের ধরন দেখে মুসলিম জাহানের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কেউ-ই সম্ভবত সন্তুষ্ট বলে মনে হয় না। বস্তুত এ সময় মুসলিম দুনিয়ার জন্য দারুল উলুম কিংবা শরীয়ত কলেজ ধরনের প্রাচীন আলেম সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। আবার পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ সরবরাহকারী কোন আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়েরও কোন সার্থকতা নেই। এখন প্রয়োজন শুধু এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের যা দুনিয়ার জন্য ইসলামের ঝান্ডাবাহী তৈরী করতে পারে।

ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত সব কটি মুসলিম দেশে বর্তমানে দু'ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে। একটা শিক্ষাব্যবস্থা নিরেট পাশ্চাত্য মন-মানসিকতা ও চিন্তার অধিকরী এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কৃষ্টির নিবেদিতপ্রাণ সেবক গড়ে তুলছে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত লোকেরাই এখন মুসলিম দেশগুলোর শাসন ক্ষমতায় আসীন। তাদের হাতেই অর্থনীতির চাবিকাঠি। রাজনীতির বাগডোর এখন তাদেরই হাতে এবং সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার রূপকারও তারাই। তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইসলাম সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার কাছে নতজানু। এ জন্য তারা সারা দুনিয়ার মুসলিম উম্মাহকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে ইসলাম বিরোধী পথে টেনে নিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় শিক্ষাব্যবস্থা তৈরী করছে ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী আলেম সমাজ। তারা সাধারণত পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ। মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনযাত্রার রক্ষণাবেক্ষণের কাজেই তারা ব্যস্ত। দুনিয়ার কোথাও তারা এতটা যোগ্য ও দক্ষ নন যে, সামগ্রিক জাতীয় জীবনের কান্ডারী ও চালক হতে পারেন। সব জায়গায় তারা কেবল গাড়ীর ব্রেকের কাজ করছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ মুসলিম উম্মাহর গাড়ীকে যে দ্রুততার সাথে বিপথে টেনে নিয়ে যাচেছ, সেই উদ্দাম গতিতে বাধার সৃষ্টি করা ও গতি কমানো ছাড়া আর কিছুই করার সাধ্য তাদের নেই। আমরা দেখতে পাচিছ প্রতিটি মুসলিম দেশে

এই ব্রেক প্রতিনিয়ত দুর্বল হয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয়, কোন কোন দেশে তো মাতাল ড্রাইভাররা এই ব্রেক ভেঙ্গে ফেলেছে এবং দ্বিধাহীন চিত্তে নিজ জাতিকে নাস্তিকতা ও পাপ পঙ্কিলতার দিকে অতি দ্রুত নিয়ে যাচেছ। অবশিষ্ট মুসলিম দেশেগুলোতেও এই ব্রেক ভেঙ্গে পড়ার আগেই আমাদের এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার চিন্তা করতে হবে যার সাহায্যে যুগপৎ দ্বীন ও দুনিয়াকে বুঝার মতো যোগ্য শিক্ষিত লোক তৈরী হবে। যারা এই উম্মতের গাড়ী চালক হতে পারবে এবং তারা চারিত্রিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় ধরনের যোগ্যতার দিক দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবে।

মুসলিম জাহানের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই প্রয়োজন পূরণ করতে পারছে না। মুসলিম জগতের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি আজ দিশেহারা। তারা ভাবছেন সময় থাকতে এ ধরনের একটা শিক্ষাব্যবস্থা যদি গড়ে তোলা না যায় তাহলে মুসলিম জাতিকে সম্ভাব্য ধর্মীয় ও নৈতিক সর্বগ্রাসী ধ্বংস থেকে রক্ষা করা যাবে না। এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে যে উপায় উপকরণ দরকার তা কেবল সরকারই সরবরাহ করতে পারে। অথচ মুসলিম দেশসমূহের সরকারী ক্ষমতা কি ধরনের লোকদের হাতে রয়েছে তা কারো অজানা নেই। এমতাবস্থায় আমি শুধু এটুকুই করতে পারি যে, উক্ত প্রয়োজন পূরণ করার উপযুক্ত একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যে পরিকল্পনা আমার মনে রয়েছে সেটা মুসলিম জগতের কাছে পেশ করি। হয়তো এটা চিন্তাশীল ও জ্ঞানীজনদের মনোপুত হবে এবং মুসলিম সরকার এটা বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসবে অথবা আল্লাহ কিছু বিত্তশালী লোকদের চিত্তকে এ জন্য উদ্যোগী হওয়ার তাওফিক দেবেন।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমার প্রস্তাবসমূহ সংক্ষেপে পেশ করছি ঃ

সবার আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই অনুসারে এর সমগ্র নীতি ও ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা কর্মচারী থাকবেন তারাও ঐ নীতি ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করবেন। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎপরতার বিচার করবেন তারাও ঐ মাপকাঠিতে যাচাই করে দেখবে যে বিশ্ববিদ্যালয় তার লক্ষ্য অর্জনে কতখানি সফল। আমার মতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ হওয়া উচিত ঃ

১। এমন সুযোগ্য ও সত্যনিষ্ঠ আলেম তৈরী করবে যারা এই আধুনিক যুগে খাঁটি ইসলামী আদর্শ মোতাবেক দুনিয়ার নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।

২। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার মধ্যে এর কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্যান্য বিদ্যা কেবল এ উদ্দেশ্যেই পড়ানো হবে যাতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য সহায়ক হয়। ঐ সব বিদ্যায় পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ তৈরী করার দায়িত্ব এ বিশ্ববিদ্যালয় বহন করবে।

৩। এটা অবশ্যই একটা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া চাই। ছাত্র এবং শিক্ষকগণ সব সময় এখানেই অবস্থান করবেন।

৪। সারা দুনিয়ার মুসলিম ছাত্রের জন্য এর দরজা খোলা রাখা উচিত, যাতে সব দেশের ছাত্র অবাধে এতে ভর্তি হতে পারে।

৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ এরূপ হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাকওয়া ও উন্নত নৈতিক চরিত্র বিকশিত হয় এবং তাদের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতি শিকড় গেড়ে বসে। একে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব থেকে রক্ষা করতে হবে যাতে পাশ্চাত্যের কাছে পরাভূত জাতিগুলোর মধ্যে আজকাল সর্বত্র যে দাসসুলভ ও পরাজিত মনোভাব সৃষ্টি হচেছ তা তাদের মধ্যেও সৃষ্টি না হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাশ্চাত্য পোষাক-পরিচছদ নিষিদ্ধ হতে হবে। ছাত্রদের আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনের জন্য পাশ্চাত্য ধাচের খেলাধুলার পরিবর্তে ঘোড় সওয়ারী, সাঁতার, চাঁদমারি, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার, মোটর সাইকেল ও গাড়ী চালনার ট্রেনিং এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিনোদন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এর সাথে সাথে তাদেরকে কিছু সামরিক ট্রেনিংও দিতে হবে।

৬। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক নির্বাচন শুধু মাত্র বিদ্যাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে না হওয়া চাই। সকল শিক্ষক আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা ও মতামত এবং বাস্তব জীবনের দিক দিয়ে সৎ ও খোদাভীরু হওয়া চাই। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশ থেকে ভালোভাবে যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে এমন সব শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে যারা উচচ মানের বিদ্যাগত যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাসে খাঁটি মুসলমান ও ইসলামী বিধানের যথার্থ অনুসারী হবে এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কাছে পরাজিতমনা হবে না। এমনকি আমি এটাও জরুরী মনে করি যে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা শিক্ষক হবেন তাদের পরিবারভুক্ত লোকদেরও শরিয়তের পাবন্ধ হওয়া চাই। এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই নিয়োগদান করা উচিত হবে। কেননা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা যদি ছাত্রদের সাথে এমন শিক্ষক থাকেন যাদের পরিবারে অ-ইসলামী চাল-চলনে অভ্যস্থ এবং যাদের

ঘর থেকে গানের সুর-লহরী উত্থিত হয়, তাহলে সে রকম শিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্ররা ভাল শিক্ষা পাবে না।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ট্রেনিং দিয়ে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গুণাবলী সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে ঃ

(ক) ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ এবং দুনিয়ায় তাকে বিজয়ী করার দৃঢ়সংকল্প।

(খ) ইসলামী চরিত্র সৃষ্টি এবং ইসলামী বিধান মেনে চলার অভ্যাস।

(গ) ইসলামী বিধান সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান এবং প্রয়োজনে ইসলামী বিধান প্রণয়নের যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন।

(ঘ) শরীয়তের বিধান নিয়ে সংকীর্ণ দলাদলী ও বিভেদ থেকে দূরে থাকা।

(ঙ) লেখা, বক্তৃতা ও বিতর্কে ভালো যোগ্যতা এবং ইসলাম প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা।

(চ) কষ্ট সহিষ্ণুতা, পরিশ্রম, চৌকোষ ও সচকিত থাকার অভ্যাস এবং নিজের হাতে সব রকমের কাজ করার যোগ্যতা।

(ছ) সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও নেতৃত্বের যোগ্যতা।

৮। একমাত্র মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ ছাত্ররাই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে। আরব দেশসমূহ থেকে আগত ছাত্ররা সরাসরি ভর্তি হতে পারবে কিন্তু অনারব ছাত্ররা আরবী ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী না হলে তাদের জন্য এক বছরের আলাদা কোর্স ঠিক করতে হবে। এই ভাবে তাদেরকে আরবী ভাষায় লেখা বই-পুস্তক পড়ে বুঝবার যোগ্য করে তোলা যাবে।

৯। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল হবে ৯ বছরের। প্রথম স্তরে ৪ বছর, দ্বিতীয় স্তরে ৩ বছর এবং তৃতীয় স্তরে ২ বছরের শিক্ষারব্যবস্থা থাকবে।

১০। প্রথম স্তরে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো ৪ বছরের উপযোগী করে ৪ ভাগে ভাগ করে শিক্ষা দিতে হবে।

ক) **ইসলামী আকায়েদ** ঃ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামের আকীদা কি কি এবং তার স্বপক্ষে কি কি যুক্তি-প্রমাণ আছে, মুসলমানদের মধ্যে আকীদাগত বিরোধ কিভাবে ও কি ধারাক্রমে উদ্ভুত হয়েছে এবং বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে কয়টি আকীদাগত মাযহাব রয়েছে তার ব্যাখ্যাও তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। এ বিষয়গুলোর নেহায়েত বিদ্যাগত সীমায় সীমিত থাকতে হবে এবং আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে তর্ক-বিতর্ক একেবারেই পরিহার করতে হবে।

খ) **ইসলামী জীবন-পদ্ধতি** ঃ এ পর্যায়ে ছাত্রদেরকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে পরিচিত করিয়ে দিতে হবে। ইসলামের মৌলিক মতবাদ ও চিন্তাধারা এই মতবাদ ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে সে মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব কিভাবে গঠন করে, এরপর দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন থেকে নিয়ে অর্থনীতি, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যন্ত মুসলিম সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে কোন্ কোন্ মূলনীতির ভিত্তিতে সংগঠিত ও বিন্যস্ত করে এবং এভাবে সমগ্র ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপকাঠামোটা কি রকম দাঁড়ায় তা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

গ) **কুরআন** ঃ চার বছর সময়ের মধ্যে সমগ্র কুরআন সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহ পড়িয়ে দিতে হবে। এ জন্য তাফসীরের কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে এমনভাবে কুরআনের দারস্ দেবেন যাতে ছাত্ররা কুরআনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বক্তব্য ভালমত বুঝতে পারে এবং তাদের মন-মগজে যেসব সন্দেহ-সংশয় ও প্রশ্ন জাগবে তা নিরসন করবেন।

ঘ) **হাদীস** ঃ ছাত্রদেরকে সংক্ষেপে হাদীসের ইতিহাস, উসূলে হাদীস এবং হাদীস যে ইসলামী আইনের একটা অপরিহার্য উৎস, তা ছাত্রদেরকে যুক্তি প্রমাণসহ বুঝিয়ে দিতে হবে। এরপর হাদীসের যে কোন একটা সংকলন আগাগোড়া পড়িয়ে দিতে হবে যথা মুনতাকাল আখবার, বুলুগুল মুরাম অথবা মিশকাতুল মাসাবীহ।

ঙ) **ফিকাহ** ঃ ফিকাহ শাস্ত্রের ইতিহাস ও মূলনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পুস্তক পড়ানোর পর ছাত্রদেরকে ফিকাহ শাস্ত্রের শিক্ষা এমনভাবে দিতে হবে যেন, ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের বিভিন্ন মাযহাব ও মতসহ ফিকাহ শাস্ত্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ মাসলা-মাসায়েল ছাত্ররা জানতে পারে। অতঃপর মুজতাহিদ ইমামগণ কিভাবে স্বাধীন বিচার-বিবেচনার দ্বারা মূল উৎসে থেকে শরিয়তের বিস্তারিত বিধি-বিধান রচনা করেছেন তাও যেন তারা অবগত হয়।

চ) **ইসলামের ইতিহাস** ঃ নবীদের ইতিহাস দিয়ে ইসলামের ইতিহাস আরম্ভ করতে হবে। বিশেষত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনেতিহাস বিস্তারিতভাবে পড়িয়ে ইসলামের সমগ্র ইতিহাসটা মোটামুটিভাবে ছাত্রদের গোচরে আনতে হবে।

ছ) **সমাজ বিজ্ঞান** ঃ এ পর্যায়ে বিশেষভাবে অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান পড়াতে হবে। এসব বিষয় পড়ানোর জন্য এমনসব অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে যারা শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা

করতে পারবেন এবং পাশ্চাত্য মতবাদ ও চিন্তাধারাকে হুবহু ছাত্রদের মাথায় প্রবিষ্ট করাবেন না।

জ) বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্ম বিশেষত ইহুদীধর্ম, খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানদান করার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝ) আধুনিক পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও তার প্রধান প্রধান শাখা, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসীবাদ প্রভৃতি।

ঞ) ইংরেজী, জার্মান ও ফরাসী ভাষার যে কোন একটা শেখাতে হবে।

১০। দ্বিতীয় স্তরে পাঁচটি অনুষদ থাকবে যথাঃ তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, কালামশাস্ত্র বা ইলমুল কালাম এবং ইতিহাস।

১১। **তাফসীর অনুষদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকবে ঃ**

ক) কুরআন

খ) তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস, তাফসীরকারদের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী।

গ) কুরআনের বিভিন্ন পঠনরীতি।

ঘ) তাফসীর শাস্ত্রের মূলনীতি বা উসূলে তাফসীর।

ঙ) কুরআনের বিস্তারিত ও গভীর অধ্যয়ন।

চ) বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনের বিরুদ্ধে যে আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তার চুলচেরা পর্যালোচনা ও দাঁত ভাঙ্গা জবাব দান।

ছ) কুরআনে বর্ণীত শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহ।

১২। **হাদীস অনুষদ** ঃ এই অনুষদে থাকবে-

ক) হাদীস সংকলনের ইতিহাস

খ) হাদীস সংক্রান্ত বিভিন্ন শাস্ত্র ও তার সকল শাখা।

গ) প্রধান হাদীস গ্রন্থসমূহের কোন একখানা গ্রন্থ বিস্তারিত সমালোচনা ও পর্যালোচনাসহ পড়িয়ে দিতে হবে যাতে ছাত্ররা মুহাদ্দিসের মত হাদীসের প্রমাণ্যতা যাচাই করার ভালো ট্রেনিং পেতে পারে।

ঘ) শীর্ষ স্থানীয় ছয়খানা বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থের সামগ্রিক মোটামুটি জ্ঞান।

ঙ) হাদীসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহলের উত্থাপিত আপত্তি সমূহের বিস্তারিত পর্যালোচনা ও তার জবাব।

১৩। **ফিকাহ্ অনুষদ ঃ**

এ অনুষদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকবে ঃ

ক) ফিকাহ্ শাস্ত্রের মূলনীতি বা উসূলে ফিকাহ্।

খ) ফেকাহ্ শাস্ত্রের ইতিহাস।

গ) আধুনিক আইন তত্ত্ব বা এর দার্শনিক পটভূমি।

ঘ) রোমান ও ইরানী আইন, ইহুদী আইন, আধুনিক মানব রচিত আইন ও ইসলামী আইনের তুলনামূলক অধ্যয়ন।

ঙ) মুসলিম ফিকাহশাস্ত্রকারদের বিভিন্ন মাযহাব ও তার মূলনীতি।

চ) মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে সরাসরি আইন রচনার অনুশীলন।

ছ) আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের চার মাযহাবের ফিকাহ্, সেই সাথে যাহেরী ফেকাহ্, যায়দী ফিকাহ ও জা'ফরী ফেকাহ্।

১৪। **কালাম শাস্ত্র অনুষদ ঃ** (আকীদা শাস্ত্র) এতে থাকবে-

ক) যুক্তি বিদ্যার মৌলতত্ত্ব।

খ) প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন।

গ) মুসলমানদের মধ্যে কালাম শাস্ত্রের উন্মেষ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্তকার ইতিহাস এবং বাইরের ও ভেতরের প্রভাব থেকে উদ্ভূত মুসলমানদের বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব ও মতবাদ।

ঘ) কালাম শাস্ত্রের বিধান ও তাতে কুরআন ও সুন্নাহর অবদান।

ঙ) ইসলামের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীদের নানারকম আপত্তি ও প্রশ্নাবলীর বিস্তারিত পর্যালোচনা ও তার জবাব।

চ) বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক অধ্যয়ন। বিশেষতঃ খৃস্টবাদের ইতিহাস, খ্রিস্টানদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও তাদের আকীদা শাস্ত্রের বিবরণ ও বিস্তারিত পর্যালোচনা।

ছ) খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচার কার্য এবং তাদের পদ্ধতি ও কৌশল।

১৫। **ইসলামের ইতিহাস অনুষদ ঃ**

ক) ইতিহাস দর্শন, ইতিহাস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য এবং কুরআনের আলোকে ইতিহাস পড়ার নিয়ম-পদ্ধতি।

খ) ইবনে খালদুন থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাস দর্শনের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা।

গ) ইসলাম প্রতিষ্ঠা পূর্ব যুগের আরব জগত ও মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস।

ঘ) চিন্তাধারা, নৈতিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা, রাজনীতির বিবর্তনের আলোকে বিশ্ব-নবীর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাস।

ঙ) ইসলামী পূনর্জাগরণের আন্দোলনসমূহ।

চ) মুসলিম দেশসমূহের উপর পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদের আধিপত্যের ইতিহাস এবং তার পরিণতি ও ফলাফল।

১৬। তৃতীয় স্তরের ছাত্ররা উল্লিখিত অনুষদগুলোর কোন একটিতে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে দু'বছর গবেষণা করার পর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে দাখিল করবে এবং তা ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করে দেখার পর তাকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করবেন।

১৭। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি উঁচুমানের লাইব্রেরী থাকবে-যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখিত প্রয়োজনসমূহ পূরণের জন্য বিপুল সংখ্যক পুস্তক থাকবে।

১৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও বিভাগের জন্য যথোপযুক্ত পাঠ্য বই নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিয়োগ করতে হবে।

১৯। প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক রচনার জন্য একটা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নারী শিক্ষা

[নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি মাওলানা মওদূদীর তদানিন্তন পাকিস্তান শিক্ষা কমিশনকে দেয়া সুদীর্ঘ স্মারক লিপির অংশ। প্রয়োজন ও উপযোগিতার বিচারে এর অনুবাদ করা হলো। -অনুবাদক]

নারীর শিক্ষা পুরুষের মতই জরুরী। নারীদের অজ্ঞ ও অনগ্রসর রেখে পৃথিবীতে কোন জাতিই উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। এ জন্য মুসলিম পুরুষদের মত মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্যও যতদুর সম্ভব উন্নত ব্যবস্থা করা উচিত। এমনকি তাদেরকে সামরিক ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা আমাদেরকে এমন সব অত্যাচারী ও আধীপত্যবাদী জাতির সাথে পাল্লা দিয়ে থাকতে হচ্ছে, যারা মানবতার কোন সীমানা লংঘনেই সংকোচবোধ করে না। খোদা না করুন, তাদের সাথে কোন যুদ্ধবিগ্রহ বেধে গেলে তারা কি কি ধরনের বর্বরতার পরিচয় দেবে, তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কাজেই আমাদের কর্তব্য নারীদেরকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত করা। তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা মুসলিম। সুতরাং আমরা যা কিছু করবো তা যেন আমাদের ঈমানের পরিপন্থী না হয় এবং যেসব মূল্যবোধ ও সভ্যজনোচিত বিধি-নিষেধ মানতে আমরা ইসলাম কর্তৃক আদিষ্ট, তারও খেলাফ না হয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আমাদের সভ্যতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, সে কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এ দুটোর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই যে, নারী যতক্ষণ পুরুষ সেজে পুরুষোচিত দায়িত্ব পালনে এগিয়ে না আসে, ততক্ষণ পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীকে সম্মান দেয় না এবং তার কোন অধিকার স্বীকার করে না। কিন্তু আমাদের সভ্যতা ও শিক্ষা নারীকে নারী রেখেই তার যথোচিত সম্মান ও অধিকার প্রদান করে। তার উপর শুধুমাত্র সেই সব সামাজিক দায়িত্বই অর্পন করে যা স্বয়ং প্রকৃতি তার উপর স্বাভাবিক নিয়মে অর্পন করেছে। সুতরাং আমাদের

নারীদের শিক্ষারব্যবস্থাটা তাদের স্বভাবের দাবী ও প্রয়োজন অনুসারে হতে হবে এবং পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হতে হবে। এ ক্ষেত্রে সর্বনিম্নস্তর থেকে নিয়ে সর্বোচচ স্তর পর্যন্ত কোথাও সহশিক্ষার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব আনুষঙ্গিক সংস্কারমূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন, তা নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষদের অনুরূপ হওয়া দরকার। প্রাইমারী থেকে বিশেষজ্ঞীয় স্তর পর্যন্ত যেসব সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেয়ার কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, এ ক্ষেত্রেও তা অপরিবর্তিত থাকবে।

এ ছাড়া নারীদের শিক্ষায় এ কথাটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার যে, তাদের আসল ও স্বাভাবিক দায়িত্ব হলো গার্হস্থ্য জীবন পরিচালনা ও মানুষ গড়া, কৃষি খামার, কল-কারখানা, অফিস-আদালত চালানো নয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কাজ হবে নারী জাতিকে একটা সাচচা মুসলিম জাতি গঠনের যোগ্য করে তোলা যে জাতি দুনিয়ার সামনে স্রষ্টার রচিত কল্যাণকর ও স্বাভাবিক জীবনব্যবস্থার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে।